বিজ্ঞানভিত্তিক পরিচালনা

শ্রীভূপাল দত্ত

বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা

4300
19.8.88

বিজ্ঞানভিত্তিক পরিচালনা

ভূপাল দত্ত

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা-১ ॥ কলিকাতা-২৯

VICHITRA VIDYA GRANTHAMALA : 24
VIJNAN BHITTIK PARICHALANA
By Bhupal Datta

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৮২

প্রকাশক
শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড
জি জ্ঞা সা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-২৯
১এ ও ৩৩ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীঅধীরচন্দ্র ঘোষ
কালিকা জব প্রেস
১০৯/বি কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯
১. ১

প্রাক কথা

অনেক বছর ধরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাশের ছেলেদের পড়াচ্ছি, বিষয় প্রোডাকশন, ম্যানেজমেন্ট, অর্গ্যানিজেশন, হিউম্যান রিলেশন—সব মিলিয়ে যাকে বলা হয় পরিচালনা-বিজ্ঞান। কয়েক বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত বিজ্ঞানের ছাত্রদেরও পড়িয়েছি। এই বিষয়ে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম এদেশে, ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় শিল্পে কাজ করে। আমেরিকায় আমার টেলর-বন্ধু শ্রীমতী লিলিয়ান গিলব্রেথের কাছে পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল, তাঁরই সহযোগিতায় স্থাপিত 'মেথড স্টাডি ইনষ্টিটিউটে' কাজ শেখার সুযোগও লাভ করি। কয়েক বছরের মধ্যেই পরিচালনা-বিজ্ঞানের প্রচুর বিকাশ হয়েছে বিদেশে, শুধু এরই জন্য সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে আলাদা চারটি ইনষ্টিটিউট খোলা হয়েছে এখানে, আর তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং আর কমার্সে আছে বিশেষ ডিপ্লোমা কোর্স।

আমাদের দেশের পরিচালনা ব্যবস্থা ভেতর থেকে ভাল ভাবে বুঝতে, হাতে নাতে যাচাই করার সুযোগ পাই দু বছর আগে একটি সরকার-পরিচালিত রুগ্ন শিল্পের চেয়ারম্যান হিসেবে। সেখানকার সব রকমের সাধারণ কর্মী শ্রমিক-নেতা, পরিচালনায় নিযুক্ত মাঝারি নিচু উঁচু মহলের পরিচালকদের সংস্পর্শে আসার, আর তাদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনার সুযোগ আমি পেয়েছি। তাতে আমার কাছে এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শিল্পে নিয়োজিত সাধারণ লোকের পরিচালক আর পরিচালনা সম্বন্ধে ধারণা, শোনা কথা আর শ্লোগানের মধ্যেই সীমিত, আর যাঁরা একটু বেশি জানেন তাঁদের জানার ব্যাপকতাও যে বেশি তা নয়; প্রয়োগের জন্য যে গভীর জ্ঞান, ধৈর্য, সহানুভূতিশীল মন এবং সময়ের প্রয়োজন হয় সেটা প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে তাঁদের দেওয়া সম্ভব হয় না।

শিল্পে নিয়োজিত সব রকমের কর্মীকে পরিচালনা বিষয়ে মোটামুটি ধারণা দেবার জন্য বাংলা ভাষায় কোন সহজ সরল বই-ই আমার চোখ পড়েনি। অথচ সবাই না বুঝলে, সকলের সহযোগিতা না পেলে শিল্প কিভাবে এগোবে? তখন আলোচনায় আমি কি বলতে চাই, সেটা নিজে সঠিকভাবে জানবার জন্য বাংলায়

তা লিখতে শুরু করি। আলোচ্য বিষয়ের সবকিছুই, প্রশ্ন, উত্তর, বিষয়বস্তু সবই যদিও একটি বিশেষ শিল্পকে কেন্দ্র করে বলা হয়েছে, তবুও উদাহরণসমূহ সকলের জানা বিষয় থেকে নেওয়া, উত্তরগুলিও সব শিল্পেই সমান ভাবে প্রযোজ্য। এই বিশেষ শিল্পটি দু বছরেই আশাতীত সাফল্য দেখিয়েছে, উৎপাদন বেড়েছে ন গুণ, দু বছর আগে যা ছিল ষোল লাখ তা হল এক কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ, লোকসানের জায়গায় লাভের মুখ দেখেছে। আমরা সবাই জানতে আগ্রহী কেন, কিভাবে এটা সম্ভব হল, কোন্ প্রেরণায় এই অচল রথ চলতে শুরু করল? এতে কার কতটা অবদান,—যদি সত্যিই কোন অবদান থেকে থাকে।

এই সূত্রে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি লাইন মনে পড়েছে—

রথযাত্রা লোকারণ্য মহা ধুমধাম
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম
রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি,
মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসে অন্তর্যামী।

কি কারণে এটা সম্ভব হল সেটা আমি জানি না, কোন একটা কারণ নিশ্চয় নয়। অনেক কিছু কারণ থাকাই সম্ভব। তবে এটুকু আমি জোর গলায় বলতে পারি, এটা হয়েছে এই শিল্পের নিয়োজিত কর্মিসাধারণের সমবেত প্রচেষ্টায় আর অক্লান্ত পরিশ্রমে। সকলে, কি সরকার, পরিচালক বা সহকর্মিবৃন্দ সকলেই সবকিছু স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে হাত লাগিয়েছে অচল রথকে সচল করতে।

শিল্পে এই সাফল্য দেখে আমার লেখাগুলি নিয়ে এসেছিলাম 'জিজ্ঞাসা' প্রতিষ্ঠানে; সত্যি বলতে কি ভয়ে ভয়ে, যাচাই করতে। কারণ আমি জানি এটা কোন পাঠ্য বই নয়, যাঁরা পাঠ্য বই চান তাঁরা অনেক ভাল ভাল ইংরাজি বই পাবেন। অন্য দিকে বইটা নিয়মমাফিক ভাষা আর পরিভাষার ধার ধারে নি, গুরুচণ্ডালি দোষে ভরা। কলেজে পড়াবার সময় আর শিল্পে আলোচনার সময় আমরা যেভাবে কথা বলি সেই ভাবেই লেখা। স্টাইলটা 'কেস স্টাডি' ধরনের, যা দিয়ে সহজে সরল ভাষায় তত্ত্বের মধ্যে না গিয়ে নিজের বক্তব্য বলা যায়, সাধারণ পাঠকের কাছে সহজ পাঠ্য বইতে পরিচালনার কয়েকটি দিক তুলে ধরা যায়

আমি তো পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের হাতে তুলে দিয়ে জিজ্ঞাসার অফিসে আর পা বাড়াইনি, বইখানি যে প্রকাশিত হবে এমন আশাও মনে রাখিনি। হঠাৎ একদিন দেখি প্রকাশকের কাছ থেকে প্রুফ এসে হাজির, প্রায় কোন কিছু পরিবর্তন না করেই ছাপাচ্ছেন জিজ্ঞাসার কর্ণধার শ্রীশবাবু এই বইটা। এতে আমি বিস্মিতই হয়েছি। এখন সুধী পাঠকেরা এই ধরনের ছোট বই কিভাবে গ্রহণ করলেন সেটা জানবার আশায় রইলাম। তাঁদের মতামত ও উৎসাহ হবে আমার চলার পথে সব থেকে মূল্যবান পাথেয়।

নিবেদক

ভূপাল দত্ত

প্রকাশকের নিবেদন

'বিজ্ঞানভিত্তিক পরিচালনা' প্রকাশরীতির দিক থেকে ভিন্ন ধরনের বই। ছোটো বড়ো শিল্প পরিচালনায় শ্রমজীবী মানুষ এবং শিল্পপতি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা যেসব অসুবিধার মুখোমুখি হন, লেখক সেসব বিষয়ে আলোচনা করেছেন এমন এক ভঙ্গিতে যা উক্ত সম্প্রদায়ে সহজবোধ্য, কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে সুখকর এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে রুচিকর নাও হতে পারে। তবু বিষয়ের অভিনবত্বের জন্য এ বই বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হল। পাঠক কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করলে বইখানি থেকে যে উপকৃত হবেন, এ ভরসা আমরা রাখি।

সূচিপত্র

টাইম স্টাডি

ফ্রেড্রিক ডব্লিউ. টেলার, সংক্ষেপে টেলার সাহেব, বিংশ শতাব্দীর একজন বিতর্কিত পুরুষ। তাঁকে মাথায় তুলে নাচবার যেমন লোকের অভাব হয়নি, তেমনি পারলে হাতে মাথা নেবার ইচ্ছাও অনেকের ছিল। আমরা ওঁর নাম শুনে থাকি বা না শুনে থাকি, ওঁর প্রভাব কিন্তু এড়াতে পারিনি। টেলার সাহেবকে বিজ্ঞানভিত্তিক পরিচালনার বা ম্যানেজমেন্টের আদি পুরুষ বলা চলে। তাঁর ধ্যান-ধারণা সূর্যের আলোর মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও কাজ শুরু হয়েছিল ষ্টিল প্ল্যান্টে, কিছু দিনের মধ্যে সেই কাজ ছড়িয়ে পড়ল সব রকম কাজে—দোকানে, হাটে, মাঠে, ব্যাঙ্কে, হাসপাতালে, কারখানায়, কোথায় নয়? ছড়িয়ে পড়ল দেশ থেকে দেশান্তরে। সবাই যে ওঁকে গুরু মানল তা নয়, তবে ওঁর দেওয়া ধারণাটা সকলের মন জয় করল। পরিচালকমণ্ডলী তো হাতে চাঁদ পেল—টেলার সাহেবকে ডাক, যত টাকা লাগে—কলেজে কলেজে ওঁর ধারণা বা নিয়মপদ্ধতি শেখাবার ধুম পড়ে গেল। এমনকি শ্রমিকরাও ওঁকে আনার জন্য ঝুলোঝুলি করতে লাগল। সব ম্যানেজার আজ ওঁরই পথের পথিক, উনি যে বীজ বপন করেছিলেন তা আজ একটা বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়েছে।

টেলার সাহেব কি এমন কাজ করেছিলেন? সাহেব কাজ শুরু করেছিলেন ষ্টিল প্ল্যান্টে সুপারভাইজার হিসাবে, বেলচা দিয়ে লরিতে মাল বোঝাইয়ের তদারকি করার কাজ। যারা ওঁর কাছে কাজ করছিল তারা সব জোয়ান তাগড়াই পুরুষ, ঘচাং করে বেলচা ঢোকাচ্ছে পাথরের স্তূপের মধ্যে, তার পরেই ছুড়ে দিচ্ছে লরির মধ্যে। সারা গা থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছে, ফাঁকে ফাঁকে একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছে, আবার শুরু করছে কাজ। টেলার সাহেবের মাথায় ঢুকল বেলচাটা একটু বড় করলে কি রকম হয়? মাল নিশ্চয় বেশি উঠবে। একবার করে দেখলে হয় না? কিন্তু করবেন কি করে? কারখানার বেলচা তো সব এক মাপের। ছুটে গেলেন কামারশালে, অনেক পটিয়ে পাটিয়ে একটু বড় করে বানালেন একটা বেলচা। এর

পরের কাজ মজুরের হাতে বেলচা ধরিয়ে দেওয়া। কিন্তু হায় খোদা, কেউ এই বেলচা নিয়ে কাজ করতে রাজি নয়, জিনিসটা মোটেই স্থবিধের নয়, কাজ করতে কষ্টও লাগে, আর তাছাড়া কেমন যেন স্থবিধের নয়। টেলারের তো কাঁদ কাঁদ অবস্থা, নিজের হাতেই লেগে পড়লেন মাল তুলতে ঐ বেলচা দিয়ে, কিন্তু কিছুতেই স্থবিধে করতে পারছেন না, আর পারবেনই বা কেন। তখন এই কলেজে-পড়া ছোকরার অবস্থা দেখে একজন মজুরের দয়া হল, বললে, দাও—তোমার যখন মাথায় ঢুকেছে আর শখ হয়েছে—দাও আমিই তুলে দিচ্ছি, তুমি কি দেখতে চাও দেখ, তা বাপু আগেই বলে রাখছি বড় বেলচা দিয়ে আমাদের বেশি খাটাতে পারবে সে কথাটা স্বপ্নেও ভেবো না। টেলর বললেন, তোবা তোবা ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। তোমাদের দেখাশুনা করাই আমার কাজ, দিনে কত লরি মাল আসবে আর বোঝাই হবে তাও বাঁধা। বেশি কাজ করার কথা আসে কোত্থেকে। আর আমিও তো তোমার মত চাকরি করি, এতে আমার কি আসে যায়। হঠাৎ মাথায় ঢুকল বেলচাটা ঐ মাপের কে বানাল কেনই বা বানাল এই সাইজের, কেউ কি ভেবেচিন্তে বানিয়েছে। একই মাপের বেলচা দিয়ে ভারী লোহা পাথরও তুলছ, আবার হালকা চুনা পাথরও তুলছ, কোন সময় বেশি আর কোন সময় কম করে নিচ্ছ। গ্রীক ইতিহাস পড়েই বোধ হয় আমার মাথায় এই পোকা ঢুকেছে, কিছুতেই আর যাচ্ছে না। রোম লিজিয়ন—অজেয় রাজকীয় সেনাবাহিনী—গায়ে বর্ম-আঁটা, হাতে ঢাল আর বর্শা—পাশাপাশি সব এগোচ্ছে, কেউ ওদের ঠেকাতে পারছে না, দুর্বার ওদের গতি। আর ঠেকাবেই কি করে, ওদের হাতে লম্বা লম্বা বর্শা, শত্রুরা যে কাছে গিয়ে তলোয়ার চালাবে তার উপায় নেই, তীর ওদের ঢালে আটকে যাচ্ছে। ঠেকাতে হলে বর্শা দিয়েই ঠেকাতে হবে। তবে বর্শা তো আর চাইলেই পাওয়া যাবে না। তার ওপরে সৈন্যরা সব তলোয়ার চালাতেই অভ্যস্ত, সাঁই করে তলোয়ার দিয়ে মাথা কাটো, বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে লড়াই আবার নূতন করে শিখতে হবে। ততদিন চাচা আপন প্রাণ বাঁচা—পালিয়ে যাবে না তো করবে কি? পড়ে থেকে জান দেবে? এর পর থেকে শুরু হল বর্শার লড়াই, কোমরে তলোয়ার তখনও আছে। বর্শা কেউ সহজে ছুড়ত না।

ছুড়লেই তো হাত খালি, কটাই বা বর্শা হাতে করে নেওয়া যায়। এ তো আর তীরের মত হালকা নয়। তাই বর্শা ডান হাতে আর বগলে চেপে ধরে, বাঁ হাতে ঢালের আড়ালে নিজেকে রেখে পাশাপাশি এগিয়ে চলো। তখন এলো আর এক ভাবনা বর্শাটা কত লম্বা হবে, লম্বা হলেই সুবিধে, শত্রুর বর্শা তোমার নাগাল পাবার আগেই ওদের সাবাড় করতে পারবে। এ সময় হল তাজ্জব এক কাণ্ড, যা কেউ শোনে নি ভাবেও নি। বর্শা-বাহিনী এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে, সামনের শত্রুর হাতে ঢাল তলোয়ার, কিন্তু পেছোচ্ছে না, অবশ্য তীর ছুড়ছে যা ওদের ঢাল রুখতে পারছে না, ফুটো হয়ে ঢুকে যাচ্ছে, তখনই হল অবাক কাণ্ড, যা কেউ দেখেনি লড়াই না করে শত্রুরা দুহাত দিয়ে বর্শার মাথাটা ধরে টানতে শুরু করেছে, প্রায় হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবার যোগাড়। বর্শা ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে প্রায় দড়ি-বাঁধা ছাগলের মত নিজেদের মধ্যে, আর তারপরেই পাশের লোক কচুকাটা করছে। বর্শা ফেলে লড়াই করবে কি খালি হাতে? পাশ থেকে তো তলোয়ার হাতে সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে। পরাজয়ের চুনকালি মেখে ফিরতে হল। না আর লম্বা বর্শা নয়, বর্শা এমন মাপের বানাতে হবে যাতে কাজ চলে, কিন্তু শত্রুরাও যেন বেকুব না বানাতে পারে।

সেই থেকে আমার মাথায় ঢুকেছে এক চিন্তা—বর্শার লড়াই তো করছি না, করছি বেলচার লড়াই, বেলচার মাথাটা কত বড় হবে, হাতলটা কতটা লম্বা হবে, কতটা মোটা হলে ধরতে আর কাজ করতে সুবিধে হবে তাই দেখতে চাইছি। নিজেই হাতে করে চালিয়ে দেখেছি, কিছুটা সুবিধে অসুবিধে আন্দাজ করতে পারছি, কিন্তু আসলে হয়েছে গোড়ায় গলদ, তোমাদের মত কাজে হাত পাকাইনি, ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তোমরা যে কাজ এক ঘটায় করছ, আমায় লাগছে দু ঘণ্টা, তাতে ভাল খারাপ কি করে বুঝব? তাই দাদা, এত সাধাসাধি। ছোকরার উৎসাহ দেখে কয়েকজনের দয়া হল, বলল, নিয়ে এসো তোমার বেলচা, দেখাই যাক কি হয়, তবে বাপু দু একদিন দেখে তো কিছু বলা যাবে না, আমরা তো এরকম বেলচাতে অভ্যস্ত নই, অন্ততঃ দিন সাতেক ব্যবহার করতে হবে। সেই হল শুরু কোন্ জিনিসের জন্য কোন্ মাপের বেলচা, কোন্ মাপের লোকের জন্য কত বড় হাতল, সবাই তো আর এক মাপের লোক

নয়, কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে, কেউ পালোয়ান, কেউ দুব্‌লা, কার কিসে সুবিধে যাচাই করা হতে লাগল।

টেলর সাহেব মহাখুশি, এতদিনে কাজের মত কাজ একটা করতে পেরেছেন। একটা সেমিনারে না হয় ব্যাপারটা নিয়ে প্রবন্ধ পড়া যাবে, কিন্তু আখেরে লাগবে কোন্ কাজে? ছুটলেন ওঁর ওপরআলার কাছে, উৎসাহ সহকারে বোঝালেন তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল। ওপরআলা অতি অমায়িক লোক, ধৈর্য সহকারে সব শুনে বললেন—তা আমাকে কি করতে হবে? তিন সাইজের বেলচা কিনতে হবে? বুঝতেই পারছ, এবারকার মত বেলচা কেনা হয়ে গেছে, হঠাৎ করে আরো কয়েকটা বেলচা কেনা যায় না, মালিক কিছু জিজ্ঞাসা করলে কি জবাব দেব? তুমি যখন বলছ এবার থেকে তোমার পছন্দ মত না হয় জিনিস কেনা যাবে। কিন্তু সত্যি করে বল তো, এতে কার কতটা ফায়দা হচ্ছে? মালিকের কিছু আসে যায় না। যারা কাজ করছে তাদের এ নিয়ে কোন ভাবনা নেই; যত মাথাব্যথা তোমার, আর ঝামেলা স্টোরের। তুমি তো বললে কাজের সুবিধে হচ্ছে। কি সুবিধে হচ্ছে, কতটা সুবিধে হচ্ছে, আদপেই হচ্ছে কি না, তা কি করে বোঝা যায়? তা বাপু আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না, তুমি যখন চাইছ কিছু বেলচা আনিয়ে দিচ্ছি।

বেলচা পেয়ে টেলর তো মহাখুশি, কিন্তু ততক্ষণে মাথায় ঢুকে গেছে কি করে বোঝা যাবে সত্যিই সুবিধে হল কি না? এও তো হতে পারে আমার উৎসাহ দেখে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে খুশি করার জন্য বলছে, অথবা ওদের এই একঘেয়ে কাজ, তাতে আমি এনেছি বৈচিত্র্য, দিয়েছি আমার অখণ্ড মনোযোগ, তাতেই ওদের সবকিছু ভাল মনে হচ্ছে, এটা তো আর বেশি দিন থাকবে না। মজুররা তো বাঁধা সময় কাজ করে, সাতটায় আসে পাঁচটায় যায়, আর কতটা কাজ করতে হবে তাও এক রকম ঠিক, লরি এলে মাল নামাও বা ওঠাও। অন্য সময় বসে থাকা। বড় খাটনির কাজ, সব সময় কাজ করা কারো পক্ষে সম্ভব না। তখন ওঁর মাথায় খেললো আর এক কথা—দেখাই যাক না কেন, এক লরি মাল বোঝাই করতে ওদের কত সময় লাগে? আমি না বললেও ওরা কোন্ মাপের বেলচা নেয়? নিশ্চয় নিজের সুবিধে মত বেলচা নেবে, কিন্তু ওদের সামনে বসে

কিছু করা চলবে না। উনি পকেটে একটা স্টপ ওয়াচ নিয়ে রাখলেন, লরি এলে কাজ শুরু হবার মুখে ঘড়িটা চালিয়ে দিতেন, একটু চোখ বুলিয়ে দেখে নিতেন কে কিরকম বেলচা নিয়েছে, তারপর কিছু করছেন না ভাব দেখিয়ে চলে যেতেন, শুধু খেয়াল রাখতেন কখন লরি বোঝাই শেষ হল, তখন পকেটে হাত দিয়ে ঘড়িটা বন্ধ করতেন, তারপরে নিজের ঘরে গিয়ে সময়মত ওটা টুকে রাখতে লাগলেন, সকলেই ভাবলো মাথার পোকা এখন গেছে। কয়েকদিন দেখার পর উনি আশার আলো দেখতে পেলেন, লোকেরা নিজের সুবিধে মত বেলচা খুঁজে নিচ্ছে আর যারা তা নিচ্ছে তারা প্রায় অর্ধেক সময়ে কাজ সেরে খোশ গল্প করছে। অনেক সময় তারা বেশ ধীরে সুস্থে গা এলিয়ে কাজ করছে। এটা প্রায় নিঃসন্দেহে প্রমাণ হল, সুবিধে মত বেলচা দিলে বেশ তাড়াতাড়ি কাজও হয় আর খাটনিও কম হয়।

মজুরের কাজের সময় বাঁধা, কাজও প্রায় বাঁধা, মাস-মাইনেও বাঁধা, বেলচা নিয়ে এত ভেবে কি হবে? সবাই এখন টেলারকে দেখলে বেলচা-বাবু বলে হাসাহাসি করছে, ওর মাথার পোকার সাইজ নিয়ে সরস মন্তব্য করছে। টেলার ভাবলেন, এদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার দায়িত্ব আমার, সময়ে সবাই আসবে আর নিজের কাজটুকু করবে, কাজ সারা হলে বসিয়ে রেখে কি লাভ, বাড়ি চলে গেলে তো কোন ক্ষতি নেই। যা ভাবা তাই কাজ, বললেন, ওহে তোমাদের কাজ হয়ে গেলে আমাকে বলে বাড়ি চলে যেতে পারো। এবার দেখা গেল, সবাই প্রায় দু একঘণ্টা আগে বাড়ি যাচ্ছে। এতদিন যারা বেলচা নিয়ে মাথা ঘামাত না তারাও ছুটে এলো সুবিধে মত বেলচা নিতে, যাতে কাজ সেরে তাড়াতাডি বাড়ি যেতে পারে। লোকজনও খুব খুশি, টেলারের খুব নামডাক, এতদিনে একজনকে দেখা গেল, যে খেটে-খাওয়া লোকজনের সুখদুঃখ বোঝে, কি করে কাজ করলে সুবিধে হয় তাই নিয়ে মাথা ঘামায়। দু'এক ঘণ্টা আগে যাবার সুবিধে অনেক, বাড়ির ছুটছাট কাজ কিছু করা যায়, আবার কেউ কেউ বাড়তি সময়ে কিছু ছুটকো কাজ করে কিছু পয়সা কমাতে লাগলো। এতদিনে পরিষ্কার ভাবে বোঝা গেল ঠিক মত যন্ত্র (tool) পেলে খাটনিও হয় কম, কাজও হয় তাড়াতাড়ি।

পিস রেট (ফুরন)

টেলর সাহেবের পরের অভিযান মেসিন-শপে। তখন লেদ-মেসিনের চল ছিল সব থেকে বেশি। কত রকমের কাজ, অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি, কত রকমের নকসা। বেলচা বাবু, এবার দেখাও তোমার কেরামতি ? এটা তো আর গোলা লোকের কাজ নয় যে দু'চারদিন কাজ করলে রপ্ত হয়ে যাবে। আগে তো পাঁচ-সাত বছর বেগার খাটো—বেগার বললে কম বলা হবে গাঁটের পয়সা দিয়ে ঢুকতে হবে, তোয়াজ করতে হবে, তবে না গুরু তোমায় কাজ শেখাবেন। আজকাল যেমন চার্টাড হতে গেলে টাকা দিয়ে তবে ফার্মে নাম লেখাতে হয়, কাজ শিখতে গেলে বড় উকিল, ডাক্তারের কাছে জুনিয়র খাটতে হয়, টাকা দেওয়ার থেকেও তোয়াজ বেশি করতে হয়, তেমনি তখনকার দিনে ভাল ইঞ্জিনিয়ারদের ছিল রবরবা। টাকা না দিলে, জানাশুনা না থাকলে কারখানায় ঢোকা যেত না—গুরুর কাছে নাড়া না বেঁধে কাজ শেখা যেত না। টেলর সাহেব খুব মন দিয়ে কাজ শিখতে লাগলেন নিজের হাতে—কি ভাবে নি-টাল করে চাকে কাজ বাঁধতে হবে, টাল কি করে দেখতে হবে, কোন্ যন্ত্রে কাজ হবে সেটা জানতে হবে, কি করে যন্ত্র ধার দিতে হবে, কিভাবে তাকে বাঁধতে হবে, কত স্পিডে জব বা স্পিন্ডল ঘুরবে, কি ভাবে লেদের স্পিড চেঞ্জ করতে হবে, কতটা কোণ দিতে হবে, ফিড কতটা হবে, তার সঙ্গে আছে সূক্ষ্ম মাপজোকের কাজ, ড্রইং পড়া—সবটাতে হাত পাকাতে হবে, তবে না তুমি মিস্ত্রি হবে। পাকা মিস্ত্রিকে কিছু বলতে হবে না, ড্রইং ফেলে দাও ফিনিশড্ জব পেয়ে যাবে। একাগ্রে টেলার সাহেব কাজ শিখতে লাগলেন। মিষ্ট ব্যবহারে সকলের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিলেন, এরকম চেলা পেয়ে, বিশেষ করে লেখাপড়া জানা চেলা—যে গুরুর কথায় ওঠবস করে, তাকে পাকা মিস্ত্রিরা কাজের খুঁটিনাটি সব বোঝাতে লাগল—একে শিখিয়েও আনন্দ আছে। ছোকরা যেমন চটপটে তেমনি তাড়াতাড়ি শেখে। মানী লোকের মান দিতে জানে—যেমনি বিনয়ী তেমনি চৌখশ।

তখনকার দিনে এসব কাজে কম্পিটিশন হতো। যেমন আবৃত্তি বা

গানের হয়। দেখা যাক কে নিভু্লভাবে কত তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে। দু'চারজন তাদের মধ্যে বেশ ভাল, কি তাড়াতাড়ি কাজ করে, তাদের সঙ্গে পাল্লা দেয় কার সাধ্য। অন্য সকলের অর্ধেক সময়ে কাজ সারে। অথচ কাজ করছে হাসতে হাসতে, খোশ মেজাজে। টেলার তাদের সঙ্গে কাজে পেরে ওঠেন না—অথচ শেখবারও কিছু নেই, এ যেন—কেউ তাড়াতাড়ি পারে, কেউ পারে না। সব পাকা বা পুরোনো মিস্ত্রি যে পারে তাও নয়।

এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র টেলার নন। খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন ওরা কিভাবে কাজ করে। দেখতে লাগলেন কত জোরে ওরা জব ঘোরায়। সকলেই কি একই স্পিডে জব ঘোরায়, সকলেই কি একরকমের ফিড দেয়। ঠিক কত স্পিডে বা ফিডে কাটা চলে। যা দেওয়া যায় তার কমে কাজ করার কি সার্থকতা? এবার শুরু হল আলাদা ভাবে সব কিছু বাজিয়ে দেখার সাধনা। যেমন ধরা যাক টুল-লাইফ—টুল-লাইফ বলতে কি বোঝায়, কতক্ষণ কাটবে বা কতখানি মাল কাটবে? টুল যে ভোঁতা হলে কাটা যায় না তা নয়? কি করে বুঝব কখন টুলে ধার দিতে হবে? টুল-লাইফ কিসের কিসের ওপর নির্ভর করে? কতটা নির্ভর করে টুল-মেটিরিয়ালের ওপর—হাই কার্বন-হাই স্পিড-টাঙ্গষ্টন কার্বাইড। কুলেন্ট দিলে কতটা লাভ হবে? টুলের শেপের ওপর কি তার প্রতিক্রিয়া—কতটা রেক অ্যাঙ্গল? কতটা টুল রেডিয়াস দিলে ভাল ফিনিশ দেবে বা বেশি কাটবে—কত স্পিডে কাটতে হবে, সব কিছুকে কি একই স্পিডে কাটতে হবে তা মাইল্ড ষ্টিল বা ঢালাই ষ্টিল হোক, তামা বা এলুমিনিয়াম হোক? সবরকমের কাজে কি একই স্পিড দিতে হবে—টার্নিং বোরিং ড্রিলিং থ্রেডিং কত স্পিডে হবে, বেশি কোপ দিলে কতটা স্পিড কমাতে হবে, কতটা ফিড দিলে ভাল সারফেস ফিনিশ পাওয়া যায় ইত্যাদি, সব কিছুর খুঁটিনাটি বাজিয়ে নিয়ে চার্ট করলেন। ততদিনে উনি ফোরম্যান হয়েছেন। সবাইকে আগে থেকে বলে দিতে লাগলেন কোন্ টুল্ ব্যবহার করতে হবে কত স্পিডে, কত ফিড দিয়ে কাটতে হবে। এটা বলার পর থেকে সবাই বেশ তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে লাগলো, পাকা মিস্ত্রিরা তাড়াতাড়ি কাজ করলেও আগের মত সকলকে গোহারান হারাতে পারছিল না।

ঠিকমত টুল দিলে, আর কি ভাবে কাজ করতে হবে বলে দিলে, অনেক তাড়াতাড়ি কাজ শেখা যায়, ভুলও কম হয়, কাজও হয় তাড়াতাড়ি। করতে পারা যায়, আর তা করা তো ঠিক এক কথা নয়? এতদিন ধরে দিনে কতটা কাজ হবে সেটা প্রায় বাঁধা হয়ে আছে। কমপিটিশন হলে বা কোন পুরস্কার থাকলে, প্রতিযোগিতার সময় না হয় তাড়াতাড়ি কাজ করবে, তা বলে এমনি সময় কেন শুধু শুধু বেশি কাজ করবে, শুধু শুধু সে খাটতে যাবে, এতে মালিকের সুবিধে হতে পারে, কিন্তু মাঝখান থেকে কিছু লোকের চাকরি যাবে, তাই বেশি কাজ কেউ করে না। দিনে আগে যতটা করত এখনও প্রায় তাই। টেলর তখন কাজে উৎসাহ দেবার নানা উপায় খুঁজতে লাগলেন, মালিককে বোঝালেন বাঁধা মাইনেতে দিনে বেশি কাজ করার তো কোন উৎসাহ নেই, তার থেকে ওদের ফুরন করে দিলে, কাজ প্রতি কত পাবে বলে দিলে দেখবেন হু হু করে কাজ হবে। সেই থেকে কাজের দর বেঁধে দেওয়া হল, কাজ হতে লাগল হু হু করে। আগে যা পেতো, ফুরনে লোকজনেরা প্রায় তার দেড়গুণ দুগুণ পয়সা কামাতে লাগলো। মালিকের তো পোয়াবারো, কাজের হিসাব করা, কাজ দেখে নেওয়া, দর বেঁধে দেওয়া, এছাড়া আর কোন হাঙ্গামা নেই, বরং লোকজনকে আর আগের মত তাগিদ দিতে হয় না, অথচ একই মেসিন থেকে দুগুণ কাজ পাওয়া যায়। লোকজনও খুশি। একই শপ থেকে বেশি কাজ বেশি লাভ, টেলারকে নিয়ে টানাটানি—তোমার ব্যাপারটা আমাদের এখানে একটু চালু করে দাও। মেহনতি মানুষের খুব উৎসাহ, এতদিনে টেলারের কৃপায় কিছু পয়সার মুখ দেখা যাচ্ছে।

টেলার সাহেব ঝানু লোক—চাকরি ছেড়ে কনসালটিং ফার্ম খুলে বসলেন, সঙ্গে ওঁর হাতে তৈরি আরও দু চারজন। কিছু জানতে চাও, বা কিছু চালু করতে চাও আমাদের কাছে এসো সব পাবে। ফেল কড়ি মাখ তেল, আমরা তোমার কারখানায় গিয়ে সব ঠিকমত চালু করে দেব, কি করে কিভাবে কাজ করতে হয় বলে দেব—দর বেঁধে দেব। ফার্মে ছিল নিজের হাতে গড়েপিটে তৈরি করা পাকা মিস্ত্রি আর সাথী সহকর্মী—এদের বেশ তোয়াজ করে আড়ালে আড়ালে রাখা হত।

কোন্ কাজের দর ঠিক করতে হবে সেটা আগে জানিয়ে দিলে—ওঁর লোকেরা শপে হাজির। সকলের সামনে নকশা দেখে কাজ বুঝে নিলেন।

তারপর মেসিন-পত্তর চালিয়ে দেখে নিলেন কি রকম চলে, কাটিং টুলে ধার দিয়ে নিলেন, যোগাড়-যন্ত্র সব ঠিক করে নিয়ে সবার সামনে ঘড়ি ধরে কাজ শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে লাগলেন কাজ ঠিক নক্শামাফিক হচ্ছে কি না। একনাগাড়ে দশ বিশটা কাজ শেষ করে তবে থামলেন—সময়টাও দেখে নিলেন। এরপর শুরু হল কাগজে-কলমে ফুরনের দর ঠিক করা। ধরা যাক বিশটা কাজ করতে সময় লেগেছে ৩ ঘন্টা ২০ মিনিট, অর্থাৎ ২০০ মিনিট—তাহলে প্রতি কাজে সময় লেগেছে গড়ে ১০ মিনিট। কিন্তু সারাদিন তো কেউ একনাগাড়ে কাজ করতে পারে না—খানিক পরে হাঁপিয়ে উঠবে, তাছাড়া চা সিগারেট খাওয়া, বাইরে যাওয়া এসব তো থাকবেই—শপের ভাষায় 'কেটিগ টাইম'। এটা সাধারণত শতকরা ১৫ থেকে ২৫ ভাগ, গড় সময়ের। যদি শতকরা ২৫ ভাগ দেওয়া হয়—অর্থাৎ ২·৫ মিনিট-তবে কাজের সময় লাগবে ১২·৫ মিনিট। গড় সময় আর আর কেটিগ টাইম মিলিয়ে যে টাইম পাওয়া যায় তাকে বলা হয় 'স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম'। সাইন্টিফিক ম্যানেজমেণ্টের ভিত হচ্ছে এই স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম। একেই ভিত্তি করে বাদবাকি সব কিছু করা হয়। তাই সঠিক ভাবে এই সময় বের করা খুবই প্রয়োজনীয়। এই মেসিনিং ছাড়াও, কাজের যোগাড়যন্ত্র করা, কাজ বুঝে নেওয়া, ইনস্পেকশন করিয়ে কাজ পাস করানো, এসবও আছে। এসবের জন্য আলাদা সময় ধরে দেওয়া হয়, এই সময়টাকে বলা হয় 'সেটিং টাইম'। সেটিং টাইম কাজ বুঝে, মেসিন বুঝে কুড়ি মিনিট থেকে শুরু করে দু-এক ঘন্টাও হতে পারে। এই সময়টা কোন কাজের শুরুতে দেওয়া হয় একবার মাত্র; একই রকমের কাজের জন্য, প্রতিটি কাজের জন্য নয়। এই সময়টা ফুরনের সময় থেকে আলাদা। ফুরন চালু করার জন্য আমাদের দরকার কাজ-পিছু কত পাবে সেটা ঠিক করা। উদ্দেশ্য, এটা সঠিক ভাবে ঠিক করলে শ্রমিক রোজ হিসাবে যা পেত তার থেকে কিছু বেশি পাবে, সেই বেশিটুকু পাবার জন্য উৎসাহ সহকারে কাজ করবে, তাকে তাগিদ দিতে হবে না। যাতে কর্মী সেই বেশিটা পায় তার জন্য স্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের সঙ্গে আরো কিছু সময় আলাদা করে ধরে দিতে হবে এবং সেটাকে হিসাবের মধ্যে নিয়ে তবে কাজ-পিছু দর (পিস-রেট) ঠিক করতে হবে। এই যে বাড়তি সময় দেওয়া হয় এর নাম 'বোনাস টাইম', আর কর্মী যে টাকাটা মাইনের বা রোজের ওপরে পায়

তাকে বলা হয় 'প্রোডাকশন বোনাস'। যদি ঠিক করা হয় যে ফুরনে কাজ করলে শ্রমিক অন্তত শতকরা ২৫ ভাগ বেশি রোজগারের সুযোগ পাবে, তবে বোনাস টাইম হবে স্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের ২৫ পার্সেন্ট (চার ভাগের একভাগ)। এই দুটি সময় মিলিয়ে যে সময়টা হবে তাকে বলা হয় 'অ্যালাউড টাইম'। পিস-রেট এই সময়ে বসে ঠিক করা হয়। এবার হিসাবটা কি দাঁড়াবে দেখা যাক—

শ্রমিকের মাইনে প্রতি ঘণ্টায় তিন টাকা বা মিনিটে ৫ পয়সা

টাইম স্টাডি করে কাজের সময় বা 'নর্ম্যাল টাইম' পাওয়া গেছে ১৬ মিনিট

ফেটিগ্ টাইম ২৫ পার্সেন্ট হিসাবে	— ৪ মিনিট
স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম হবে দুটোকে যোগ করে	— ২০ মিনিট
বোনাস টাইম স্ট্যাণ্ডার্ড টাইমের শতকরা ২৫ ভাগ	— ৫ মিনিট
তাহলে অ্যালাউড টাইম হবে	— ২৫ মিনিট

পিস-রেট হবে, প্রতি মিনিটে ৫ পয়সা হিসাবে ১২৫ পয়সা, যত পিস করবে তার জন্য প্রতি কাজ-পিছু এক টাকা পঁচিশ পয়সা হিসেবে দেওয়া হবে। এ ছাড়াও তাকে যদি এই কাজের সেটিং-এর জন্য ১ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়ে থাকে তবে আলাদা করে আরও ৩ টাকা পাবে। যদি কেউ সেটিং আধঘণ্টায় করে তাহলেও তিন টাকা পাবে। দক্ষ মিস্ত্রিরা এই সময়টা অনেকখানি বাঁচিয়ে নেয়।

শপে শপে আর কোন কথা নেই, শুধু কে কত বোনাস পেল, কোন্ কাজের কত রেট, কি ভাবে কাজ করলে বেশি বোনাস পাওয়া যায়, কি ভাবে কাজের দর বা পিস-রেট ঠিক করা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি কথাই মুখে মুখে ঘুরতে লাগল। মেসিন সব যত পার চালু রাখ, পরিষ্কার কর, দরকার মত তেল দাও, এসব কথা আর কাউকে বলতে হচ্ছে না, মেসিনের টুকিটাকি সারাই নিজেরাই করে নিচ্ছে—কারো অপেক্ষায় বসে নেই। যে কারখানায় বোনাস চালু নেই সেখানে কেউই বড় একটা কাজ করতে রাজি নয়। কাউকে তাগাদা দেবার দরকার নেই—সবাই নিজের গরজে নিজের মনে কাজ করছে। বরং অবস্থাটা অন্যরকমের—কাজ পাবার জন্য একদিকে ফোরম্যানকে তাগাদা দিচ্ছে—অন্যদিকে স্টোরকে তাগাদা দিচ্ছে তাড়াতাড়ি মাল বের করে দেবার জন্য। যাতে তাড়াহুড়ো করে কাজ না খারাপ করে তার উপর কড়া

নজর দরকার, ইন্‌সপেকশনের ওপর খুব চাপ। তখনকার নিয়ম ছিল, কোন কাজ খারাপ করলে সেটাকে শ্রমিক নিজের সময়ে সারিয়ে পাস করাবে। বাতিল হলে কাজের পয়সা পাবেই না, উল্টে যে মাল নষ্ট করেছে তার দাম দিতে হবে। কিছুটা খারাপ যে হবেই সেটার অবশ্য দাম দিতে হবে না। তাই কাজ যাতে তৈরি হবার পর, খাটাখাটনির পর বাতিল না হয় শ্রমিকরা সেদিকে বেশি নজর দিচ্ছে। প্রায়ই ছুটে যাচ্ছে ইন্‌সপেকটারের কাছে, যাতে কোন ভুল না হয়। যখন দেখল কাজটা সে নির্ভুল ভাবে বুঝে নিয়েছে তখনই জোর কদমে কাজ শুরু করছে। মেসিনে মেসিনে ঘুরে কাজ দেখাকে বলা হয় 'পেট্রোল ইনসপেকশন'।

বেলুন ফুস (ধাক্কা)

'মহামান্য কোর্টের আদেশ'—আঠারশো নব্বই দশকের প্রথম দিকে—সরকারি কোন কারখানাতে টেলার সিস্টেম চলবে না,—কাজের রেট বেঁধে দেওয়া চলবে না—বোনাস প্রথা চালু রাখা বা করা চলবে না। এই প্রথা শিল্পের শান্তি নষ্ট করছে, একদিকে বাড়িয়েছে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি, অন্যদিকে বাড়িয়েছে মালিক আর শ্রমিকের মধ্যে মনকষাকষি—এ প্রথা চলতে দেওয়া যায় না, যেতে পারে না।

একি তুঘলকি কাণ্ড, শ্রমিকেরা বোনাস পাবে না—এ রকম শ্রমিক-স্বার্থ-বিরোধী বিচারকটি কে? কতটা কাজ করতে হবে মালিকরা বলতে পারবে না, এ করলে শিল্প চলবে কি করে? চলুন না আমরা যাই সেই বিচার সভায়—জুরি হয়ে সব কথা শুনি।

প্রথম প্রার্থী :—আমি একজন শিল্প-শ্রমিক—বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর। বিবাহিত, ছেলে-মেয়ে ছটি, বার বছর বয়সে অ্যাপ্রেনটিস হয়ে শিল্পে ঢুকেছিলাম, নবছর ধরে কাজ শিখে ২১ বছর বয়সে মিস্ত্রি হিসেবে চাকরিতে পাকা হই। চোখের সামনে দেখেছি শিল্পের ধাপে ধাপে উন্নতি, কত নতুন ধরনের মেসিন, কত রকমের টুল। আমি প্রায় সব মেসিনে কাজ করেছি, কাজের কোথাও ফাঁকি ছিল না, আজকের মালিক আর আমি একসঙ্গেই অ্যাপ্রেনটিস ছিলাম, একসঙ্গে কাজ শিখেছি—এখনও মালিক আমার বন্ধু—

হাসি ঠাট্টা করেন—আমাকে ডেকে মতলব নেন—ছেলেমেয়েদের খবর নেন। ঢুকেছিলাম চল্লিশ টাকা মাইনেতে—কাজ দেখিয়ে আর নিজের গুণে আজ আমার মাইনে ২৫০ টাকা। সবাই আমাকে খাতির করে। পাড়ার লোক দরকারে অদরকারে আমার কাছে আসে, বুদ্ধি নেয়, আমার কথাতেই মালিক অনেককে অ্যাপ্রেনটিস নিয়েছে—অনেককে চাকরি দিয়েছে। কয়েক বছর হল আমাদের কারখানায় পিস-রেট চালু হয়েছে। আর আজ দেখুন আমার অবস্থা, অল্প বয়সের ছোকরাগুলো আমার থেকে বেশি রোজগার করছে। আমার বয়স হয়েছে, আমি ওদের মত চটপটে নই, ওদের মত খাটতে পারি না। ছেলেরা, যারা বোনাস পায় তারা আর আমাকে মানতেই চায় না। এই আমার সেকশনের পিটার, যে আমার থেকে দুধাপ নিচে মাইনে পায় মাত্র ১৫০ টাকা, বোনাস সহ বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে ২৭৫ টাকা অর্থাৎ প্রায় ১২৫ টাকা বেশি, আর ফুরনে খাটলে আমিও যদি ওর সমান পরিশ্রম করি, ওর মত খাটি—যা আমার বয়সে প্রায় অসম্ভব—আমিও পাব ২৭৫ টাকা মাত্র ২৫ টাকা বেশি। এটা কোন্ ধরনের বিচার? একে তো ওর মত খাটার ক্ষমতা আমার নেই, বোনাস দূরে থাক ২৫০ টাকার কাজও আমার হয় না। আর বাড়তি ২৫ টাকার জন্য অতটা ধকল কি আমার পোষায়? ফোরম্যান থেকে আরম্ভ করে সকলে আমাকে অকর্মা ভাবতে শুরু করেছে, মান আমার ধুলোতে মিশে গিয়েছে, ঘরে-বাইরে এত অপমান আমার আর সহ্য হয় না। এত বছর সম্মানের সঙ্গে কাজ করে এই আমার অবস্থা। এর কি কোন প্রতিকার নেই? অথচ যত শক্ত আর নিপুণ কাজ আসে তার বেলায় আমার ডাক পড়ে, পয়সার বেলায় ঢুঁ ঢুঁ।

আর একজন অ্যাপ্রেনটিসের কথা শুনুন:—আমি আজ ৭ বছর ধরে কাজ শিখছি, সবে আমার একুশ বছর পূর্ণ হয়েছে। আমার আশা, এবার আমি মিস্ত্রি হব, ভালো মাইনে পাব, বাড়ির সবাই আমার মুখ চেয়ে বসে আছে। তা না, আজকে আমার হাতে একটা বিল্বপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে—হাতে দেওয়া হয়েছে ভাল সার্টিফিকেট, আর অন্য কিছু নয়। কারণ এমন কিছু নয়, ভাল ভাবে কাজ করাটাই আমার কাল হয়েছে, যতদিন অ্যাপ্রেনটিস ছিলাম ততদিন ফুরনের বাইরে, অথচ কাজ করতাম অন্যের দেড়া, মাইনে পেতাম অন্যের অর্ধেক, কাজের পড়তা পড়তো অনেক কম, এখন আমাকে

পুরো মাইনে আর বোনাস দিয়ে কোম্পানির কি লাভ? তার থেকে ওরা কয়েকজন বেশি অ্যাপ্রেনটিস রাখবে। যে কাজটা একটাকা ঘণ্টায় অ্যাপ্রেনটিস করলে খরচা পড়বে দুটাকা, তা যদি দুটাকা রোজের মিস্ত্রি করে তার দর পড়বে চারটাকা—কোম্পানি আমাকে রাখবে কেন? তাই আমাকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি এখনও চাকরিতে বহাল হইনি, তাই আমাকে ছাড়াতে কোন অসুবিধে নেই।

এইসব কাটাতে কথা হচ্ছে, পিস-রেট পয়সা হিসেবে না করে সময় ধরে করলেই তো হয়। যার যত মাইনে সে সময় হিসেবে তত বেশি টাকা পাবে। আমি যদি ৫০ ভাগ কাজ বেশি করি বোনাস বা বাড়তি মাইনে পাব আমার মাইনের ৫০ ভাগ। তাতে হয়েছে আর এক অসুবিধে। সস্তার লোক দিয়ে কাজ করাতে পারলে সাধ করে কেউ কি বেশি মাইনের লোককে দিয়ে সে কাজ করাবে? তাদের কোন পিস-রেটের কাজ দেওয়া হয় না, এমনি ছুটকো কাজ দেয় আর শক্ত শক্ত কাজ দেয় অথচ সোজাসুজি ছাড়াতে পারে না। তাই যে কাজ না দিলেই নয় তাই দিচ্ছে। পয়সাও কম পাচ্ছি, হেনস্থার একশেষ, কিছু বলারও উপায় নেই, যে কোন ছুতোতে ছাড়িয়ে দেবে। আগের দিনের মত আমাদের আর সদ্ভাব নেই, নিজেদের মধ্যে রেষারেশি—চাকরি নিয়ে টানাটানি—ওপরআলাকে তোয়াজ কর, যাতে ভালো পিস-রেটের কাজ পাওয়া যায়—পিস-রেটে এই আমাদের হাল।

ফোরম্যানের কথা শুনুন :—আমি ৩০ বছর কাজ করে এই পদে এসেছি। আজকের সব মিস্ত্রির সঙ্গে আমি হাতে হাতে কাজ করেছি, এক পাড়াতেই থাকি, প্রত্যেকের বাড়ির সকলের সঙ্গে আমার জানাশুনা। আমার ওপর ভার পড়েছে কাজ বিলি করার, হিসেব করার, কে কত বোনাস পাবে। আমার পুরোনো বন্ধুরা কেউ বোনাস পায় না, আমার অবস্থাও তথৈবচ। পড়তার পোষাচ্ছে না বলে আগেকার মিস্ত্রিদের কাজ দেওয়া হয় না। ম্যানেজারকে ওদের হয়ে বলতে গেলাম—বললেন, কি করব বল—হিসেব তুমি দেখতেই পাচ্ছ—আর আমার অবস্থাটা ভাব—তোমাদের হয়ে মালিককে বলতে গেলাম—কি শুনলাম? "তোমাদের মত বুড়োহাবড়াদের দিয়ে কিসসু কাজ হবে না। এতদিন সকলে মিলে আমাকে বোকা বানিয়েছ, সবাই

মিলে দিয়েছ ফাঁকি—তোমার না আছে কাজ করাবার ক্ষমতা, না আছে কাজ বুঝে নেবার ক্ষমতা। টেলার ছোকরা দেখিয়ে দিয়েছে, এই একই শপ থেকে ডবল কাজ করানো যায়। তোমরা এতদিন করাওনি, আর আজ ব্যাপারটা হয়ে যায় যাবার পর কাঁদুনি গাইতে এসেছ। অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে না পারলে আমার কাজ-কারবার চলবে কি করে ?"—বুঝুন কোত্থেকে এক ছোকরা এসে আমাদের মান-ইজ্জত সব ডুবিয়ে দিল ?

আবার শুনুন :—আমি একজন টেলারম্যান বা টাইম স্টাডিম্যান—পিস-রেট বেঁধে দেওয়া আমার কাজ—যাতে কাজের এফিসিয়েন্সি বাড়ে তাই আমাকে দেখতে হয়—যাতে সকলে নায্য ভাবে বাড়তি রোজগার করতে পারে তাই আমার চেষ্টা—ওরা যাতে বোনাস পেতে পারে, বোনাসের হার যাতে ঠিক হয়—আমার শপ যাতে সবার সেরা হয়, তাই আমার ধ্যানজ্ঞান। অথচ কারখানার সব লোক আমাকে এড়িয়ে চলে। কেউ কেউ তোয়াজ করে আড়ালে, যাতে পিস রেটটা একটু বাড়িয়ে দিই—তাও ছেলে-ছোকরারা ;—অন্য সবাইয়ের আমি দুচোখের বিষ। ওদের সবকিছু অসুবিধের জন্য আমিই দায়ী—ওদের সাজানো বাগান আমি তছনছ করেছি। সবাই আমার ওপর রাগে ফুঁসছে, যে-কোনদিন মার খেতে হতে পারে। চাই না একাজ করতে। তার ওপর হয়েছে আর এক ঝামেলা। যে কাজের সময় আমি এখানে বাঁধছি সেরকমের কাজ অন্য কারখানাতে হচ্ছে, সেখানেও টাইম বেঁধে দিচ্ছে ; দুটো সময় তো এক হচ্ছে না, তফাৎ কিছুটা থাকছে। যেখানে আমার টাইম বেশি সেখানে কেউ কিছু বলছে না—অবশ্য যদি-না মালিকের চোখে পড়ে, কিন্তু যখন কম হচ্ছে তখন মহা হৈ-চৈ, নিশ্চয়ই আমি ইচ্ছে করে সময় কমিয়ে দিয়েছি—কি জবাব দেব ? আমি কি করে জানব কে কোথায় কত সময় দিয়েছে ? আমার বিরুদ্ধে সবাই একজোটে নালিশ জানায়, প্রায়ই ধোলাই খাবার অবস্থা। ম্যানেজার কি বলবে ভেবে পায় না। এ কি নচ্ছার কাজ রে বাবা, কোন স্ট্যাণ্ডার্ড নেই, কোন সমতা নেই, আর থাকবেই বা কি করে, সবাই তো এক মেসিনে কাজ করছে না, সব মেসিনের অবস্থাও এক নয়, কাজ করার ধারণাও সকলের এক নয়, সব জায়গায় একই লোককে কাজ করিয়ে সময় বাঁধা হচ্ছে না। শেষ-মেষ কোন রকমে ইউনিয়নের হাতে-পায়ে ধরে একটা রফা করতে হচ্ছে, তাতে

না আছে সিস্টেম না আছে কোন বিচার—মাঝখান থেকে বিজ্ঞানভিত্তিক ম্যানেজমেণ্ট অবৈজ্ঞানিক হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

এবার একজন মালিকের কথা শুনুন, যাদের জন্য একাজ করা হচ্ছে :—আমার ছোট কারখানা, ২০০ জনের মত লোক কাজ করে, তার মধ্যে ১৪০ জন সোজাসুজি হাতে কাজ করে—প্রোডাকশন ওয়ার্কার। বাদবাকিরা কেউ মজদুর, কেউ ইনসপেক্‌টার, কেউ দারোয়ান, ক্লার্ক-রিসেপ্‌সনিস্ট—মেইনটেনেন্‌সের লোক, এছাড়া আছে সুপারভাইজার, অফিসার, আরও অনেক। কাজ বাড়লে সকলকেই বেশি খাটতে হয় কমবেশি—অথচ শুধু প্রোডাকশন ওয়ার্কারদের বোনাস দেওয়া হচ্ছে, বাদবাকিরা পাচ্ছে না। তাই তারা সকলে বেঁকে বসেছে—যে কাজটা নেহাৎ না করলে নয় তাই করে—আগ বাড়িয়ে কিছু করে না। মজদুরকে খুঁজে পাওয়া যায় না, ইনস্‌পেকটারের কাজ দেখে ওঠার সময় হয় না। সত্যিই তো ওদের বলি কি? অন্যদের বোনাস পাইয়ে দেবার জন্য ওরা কেন ভূতের বেগার খাটবে। আবার প্রত্যেকের কাজের হিসেব রেখে বোনাস দিতে হবে, প্রত্যেক কাজের দর বেঁধে দিতে হবে। একই কাজ যদি অনেকটা করতে হয় তবে না দর বাঁধার খরচা পোষায়, আমার আবার জবিং কাজই বেশি, খুচরো কাজ কম। এসবের জন্য প্রায় দশজন লোক আলাদা মোটা মাইনে দিয়ে রাখতে হচ্ছে। নাট ফল হয়েছে খরচা শতকরা বিশ ভাগ বেড়েছে, প্রোডাকশন ততটা নয়—আর বেড়েছে রেষারেষি, কেউ কাউকেও মানতে চাইছে না। কে কোন্ কাজ পেল, কোন্‌টাতে বেশি বোনাস পাওয়া যায়, কাজের হিসেব ঠিক হয়েছে কি না তার চুলচেরা বিচার। মেসিনের কেউ যত্নআত্তি করছে না, আখেরে লোকসান হতে চলেছে। হবেই না বা কেন? নতুন নতুন টাইম স্টাডিম্যান এসেছে কলেজ থেকে সদ্য পাস করা। আগেই শুনেছেন তো মিস্ত্রিদের থেকে কেউ একাজ নিতে চায় না। তারা কোনদিন নিজের হাতে কাজ করেনি, বা করলেও তা সামান্য। এসে বলেছে, মিস্ত্রি তুমি কাজ কর আমি সময় দেখি। মিস্ত্রিরা এখন ঘাগু হয়ে গেছে। স্টাডির মানে বুঝতে শিখেছে, এর ওপর ওদের আয়, খাটনি সব কিছু নির্ভর করে। তাই স্টাডির সময় ১০ মিনিটের কাজ ২০ মিনিটে করে। কিভাবে কাজ করতে হবে, কবার কতটা কোপ দিতে

হবে, কি করলে ভাল ফিনিশ হয় তার কোন ধারণাই স্টাডিম্যানের নেই। কিছু বললেই মিস্ত্রি বলবে আমি যতটুকু জানি তাই করছি। আপনি যা বলবেন সেই রকমই কাজ করব। কিন্তু কাজের দায়িত্ব নিতে পারবো না, কিছু খারাপ হলে আমাকে দুষবেন না। কলেজ-পাস ছোকরা, ও আর কি বলবে, কিছুটা আমতা আমতা করে স্পিড-ফিড দু চারটা দেখে নিয়ে হাল ছেড়ে দেয়। শেষে কি একটা কাঁচা কাজ করবে আর সকলের হাসির খোরাক হবে? মিস্ত্রির শেষ অস্ত্র তো আছেই। এই মেসিনে এর থেকে তাড়াতাড়ি হয় না, করতে গেলে কাজ খারাপ হবে, আপনি একটা করে দেখিয়ে দিন। আবার সময় বেশি দিলে যে বোনাস বেশি পাচ্ছে তা নয়, ওরা এতদিনে বুঝে গিয়েছে যতক্ষণ বোনাস ২০ কি ২৫ পার্সেন্ট—যা মালিক ভাবে, আমরা ন্যায্য পাচ্ছি, ততদিন কেউ মাথা ঘামাবে না অন্যদেরও ঈর্ষা হবে না, বেশি হলেই ছুটে আসবে স্টাডিম্যান, সে নিশ্চয় কোথাও ভুল করেছে। শপস্টুয়ার্ড এসে ধমকে বুঝিয়ে দেবে কোথায় আমাদের স্বার্থ—কতটা বোনাস পেলে মালিক নিজেকে খুব প্রোগ্রেসিভ মনে করবে—কতটা পেলে স্টাডিকে জবাবদিহি করতে হবে না—কতটা পার্থক্য নিজেদের মধ্যে রেষারেষি আনবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ কাজের ফাঁকিটা চোখে পড়বে না। এই শান্তি সবাই চায়, কি অফিসার, কি স্টাডিম্যান বা কি মিস্ত্রি, সবাই, তারা তো এক জায়গায় একসাথে কাজ করছে, কে সেখানে ঝগড়া করে টিকে থাকবে—তাতে অফিসারের স্বার্থ ই বা কি, ওকেও তো চাকরি করে খেতে হয়। আর আমার অবস্থা হয়েছে ছুঁচো গেলার মত, না পারি গিলতে না পারি ওগলাতে, একবার যারা বোনাসের স্বাদ পেয়েছে তাদের সামলাই কি করে।

আবার কারখানার আর একটা দিক দেখুন। ভাল ভাল মেশিন বাজারে এসেছে, নানারকমের টুল আগের প্রায় তিনগুণ জোরে কাটতে পারে, এসেছে কত রকমের জোগান, কিন্তু আমার আর সেসব নেবার উপায় নেই। নিলেই স্ট্রাইক—এ সব আমার নেবার একমাত্র উদ্দেশ্য না কি, রেট কাটা, তারাই বা তা আমাকে কমাতে দেবে কেন? রেট যদি একই রাখতে হয় তবে খামোকা গুচ্ছের খরচ করে কি লাভ। এর ফল হচ্ছে আরও মারাত্মক, অন্যদিকে আমাদের অনেক দিনের কারখানা, তাই মেসিন-পত্তর পুরোনো,

কাজের রেট বাঁধা ; ওদিকে নানা জায়গায় নতুন নতুন কারখানা হচ্ছে, তারা প্রথম থেকেই ভাল ভাল যোগান, ভাল ভাল মেসিন এনেছে, কোথায় কি ভাবে কাজ হয় তাদের জানা, কি ভাবে কাজ করলে সুবিধে তাও জানে, নতুন নতুন লোক নিয়েছে, কাকে কতটা কাজ করতে হবে তাও বলে দিচ্ছে—কাজের নর্ম বাঁধা। লোকজনেরা খুশি মনেই কাজ করছে—যাদের চাকরি ছিল না তারা কাজ পেয়েছে—তারা বোনাসের, পিস-রেটের ধার ধারে না—মালিক বছরের শেষে কিছু বোনাস দিলে মহা খুশি, হিসেব-পত্তরের কোন ঝামেলা নেই, নেই কোন রেষারেষি—ইউনিয়নও খুশি, ওদের প্রোডাকশন আমাদের দেড়া। হবেই না বা কেন, নতুন মেসিন, জিগ ফিক্সার, সব কিছু হাতে ধরে শেখানো—যারা আগে চাষ ছাড়া কোন কাজ পেত না—রোদ বৃষ্টি জলে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, তাদের কাছে কারখানা, চাকরি, মাইনে হাতের চাঁদ। বোনাসের ধার ধারে না, সমানে খেটে চলেছে, মুখে রা-টি নেই। তাদের পড়তা পড়ছে আমাদের থেকে অনেক অনেক কম। তাদের সঙ্গে তো আর পেরে উঠছি না। বিক্রি-বাটা নেই, প্রোডাকশন কম, লে-অফ, ছাটাই করতে হচ্ছে, ওয়ার্কাররা ক্ষেপে উঠেছে—সবই আমার চালাকি—আমার কারখানা বাঁচাবার কোন উপায় নেই, কারখানা সিক হয়ে উঠেছে—কিছু বুঝতে চায় না কেউ, সবাই মারমুখী, আমাকে কারখানা গুটিয়ে নিতে হবে, না হয় সব ছেড়েছুড়ে অন্য কোথাও গিয়ে কাজ-কারবার করতে হবে। এখনও আমার বাজারে গুড উইল আছে, তা ভাঙ্গিয়ে যদি খেতে পারি।

অন্য দিকে জেরার মুখে পড়ে বলতে হল—সিস্টেম ঠিক পারফেক্ট নয়, দরকার বুঝে অনেক অদল-বদল করতে হয়েছে, অনেক রেট কাটতে হয়েছে। প্রথমে যখন চালু হয় তখন ছিল সরল ফুরন, যতটা বেশি করবে তত টাকা। এর পরে এল হালসি সিস্টেম—বাড়তি কাজের টাকা ভাগাভাগি, মালিক পাবে তিন ভাগের দুভাগ আর মিস্ত্রি পাবে মাত্র একভাগ। এতে আপত্তি ওঠাতে এল হালসি-উয়ার সিস্টেম, যাতে টাকাটা আধাআধি বখরা হল। তাতেও খুশি নয়, চালু হল রোয়েন সিস্টেম। তাতে প্রথম দিকে মিস্ত্রির ভাগে বেশি টাকা আর প্রোডাকশন বাড়তে শুরু করলে কম টাকা—হিসেবটা এমন যে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি কেউ পাবে না বরং বেশি কাজ করলে আয় হবে

আরো কম। কেন এতসব অদল-বদল? ওয়ার্কার বেশি বোনাস পায় কেউ সহ্য করতে পারে না, না মালিক না ম্যানেজমেন্ট। এবার আপনি রায় দিন।

আশার আলো

ঘরামির কাজ শিখছে জিল, কতই বা বয়েস, কাজ শিখতে হলে এই বয়সেই শুরু করতে হয়। ইট গাঁথার কাজ, ইটকে জলে চুবিয়ে রাখতে হয়, যাতে পুরো একদিন ভাল ভাবে ভিজিয়ে আর গাঁথবার মশলা থেকে জল না টানতে পারে। শুকনো ইট মশলা থেকে সব জল টেনে নিলে চুন সুরকি আর জমাট বাঁধবে না, ঝুরো বালির মত কাজ করবে। মসলা মেশানোরও কায়দা আছে, প্রথমে শুকনো তারপরে জল—জল বেশি হলে কমজোরি হবে আর গড়িয়ে যাবে, আর শুকনো হলে চাড়িয়ে দিতে অসুবিধে। গাঁথবারও কায়দা আছে—যাতে খাড়াই আর লম্বায় দুদিকেই ওজন ঠিক থাকে, কোনো দিকে যেন হেলে বা বেঁকে না যায়। এমন ভাবে ইট বসাতে হবে যাতে সবদিকে মসলা থাকে অথচ নষ্ট না হয়, তার থেকেও বড় কথা ভেতরে যেন হাওয়া না থাকে, ফোঁপড়া না হয়, ভাল করে যেন চেপে বসে। জিল কাজ শিখছে, সব রকমের কাজ—ইটগাঁথা, কাঠের কাজ, দর-দাম জানা, হিসাবপত্তর—যাতে ভাল ঠিকাদার হতে পারে।

জিল দেখল কোন রাজমিস্ত্রি দিনে দরকার হলে ১২০০ ইট বসাতে পারে, তবে সাধারণত ৫০০-র বেশি গাঁথে না। দিনে কতটা কাজ করতে হবে সবারই একটা ধারণা আছে, মোটামুটি সবাই তাই করে—সবই একটা অলিখিত নিয়মে বাঁধা। যারা পাকা মিস্ত্রি তারা হেসেখেলে ধীরে সুস্থে কাজ করছে, বাদবাকিরা সমান কাজ করতেই হাঁকিয়ে উঠছে, পাকা মিস্ত্রিরা মাঝে মাঝে ওদের সাহায্য করছে। অলিখিত এই নিয়ম চালু করেছে কে? বেশি পয়সা দিলেও এর বেশি কাজ করে না, তবে নেহাৎ দরকার বুঝলে করে, পয়সার জন্য কখনই নয়। এই ট্র্যাডিশন সমানে আদিকাল থেকে চলে আসছে—যারা নতুন আসছে তারাও তাই মেনে চলছে, যেমন করে পারে কাজের কোটা পূরণ করছে—মাইনে নিয়ে এর কম কাজ করা তো ফাঁকির সামিল, তা ওরা করতে চায় না। আবার বেশি টাকা পেলেও

এর বেশি কাজ করার কথাও ওঠে না। হেড মিস্ত্রি দেখছে সব কাজ যাতে ঠিক মত হয়; তাদের রোজ একটু বেশি—ভাল কাজ চাইলে, ভাল জিনিস চাইলে, নামডাকওয়ালা রাজমিস্ত্রিকে ডাকুন, কিছু বলতে হবে না—সব কিছু দায়িত্ব ছেড়ে দিন, দেখবেন কেমন ভাল কাজ হয়—ওদের কাজে মাথা গলানো ওরা মোটেই পছন্দ করে না।

জিল ভেবেই পায় না কিভাবে ওরা ১২০০ ইট গাঁথতে পারে—এটা তো আর মেসিনের কাজ নয় যে স্পিড বাড়িয়ে দিলাম বা বড় মেসিন কিনলাম। পুরোপুরিটাই হাতের কাজ, কি করে এতটা সম্ভব?—আমার কথায় যদি বিশ্বাস না হয় তবে একটা ছোট্ট নিরীক্ষা করে দেখুন না? দশ মিনিটের এক্সপেরিমেন্ট—না না এমন কিছু লাগবে না শুধু কাগজ আর পেন্সিল। আপনি সাধারণ ভাবে যে রকম লেখেন সেই ভাবে ৫ মিনিট ধরে খাতায় আপনার নাম লিখুন আর গুণে দেখুন কতবার লিখেছেন। এরপর যত তাড়াতাড়ি পারেন আবার ৫ মিনিট একই রকমে আপনার নাম লিখুন। দেখবেন যাতে পড়া যায়, আবার কোন সর্টকাট করেন নি তো অর্থাৎ এবার দিলেন ইনিসিয়্যাল। গুনে দেখুন কতবার লিখতে পেরেছেন। যদি চান তো আরো ৫ মিনিট ধরে ধীরে সুস্থে আপনার নাম লিখতে পারেন। দেখুন তো এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল, তাড়াতাড়িতে লিখে আপনি প্রথম বারের থেকে কত পার্শেন্ট হারে বেশি লিখেছেন, আর ধীরে সুস্থে লিখে কত পার্শেন্ট কম লিখেছেন। যদি না অস্বাভাবিক কিছু হয়, তবে তফাৎটা ২৫ পার্শেন্টের বেশি হবে না, বা সবার থেকে তাড়াতাড়ি সবার থেকে ধীরে তফাৎ ৬০ পার্শেন্টের মধ্যে থাকবে; কয়েক হাজার ছেলের ওপর সমীক্ষা করে আমি তো এই ফলই পেয়েছি—আপনি যদি না করতে চান এই একসপেরিমেন্ট, তবে অ্যাথলিটের পারফরমেন্স দেখুন, খুব জোরে যারা ছোটে তাদের ১০০ মিটারের টাইম ১০ সেকেণ্ড, আর সাধারণ স্কুল স্পোর্টসের টাইমও ১৩ সেকেণ্ডের বেশি হয় না, তফাৎ ৩০ পার্শেন্ট। আপনি যে কোন ইভেন্ট নিন না কেন সাধারণ আর খুব ভালো কিংবা খুব খারাপের মধ্যে তফাৎ ২৫-৩০ পার্শেন্টের বেশি হবে না।

তাই যদি হয় তবে একজন প্রায় আড়াই গুণ বেশি কাজ কি ভাবে করতে পারে? নিজে চেষ্টা করে তিনি তার ধারে কাছেও যেতে পারছেন না।

তখন থেকে তিনি পাকা মিস্ত্রির কাজ খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন—ইট কোন্‌দিকে রাখছে—সুরকি কোন্‌দিকে, হাতের থেকে কতটা দূরে, কোন্ কাজটা আগে করছে কি ভাবে করছে? একে বলা হয় 'মেথড স্টাডি' পরে অন্য নাম চালু হয়েছে 'ওয়ার্ক স্টাডি', এর পরের ধাপে মেশিন স্টাডি, মাইক্রোমোশন স্টাডি, খেলার ছবি দেখাবার সময় স্লো স্পিডে যেমন সব কিছু মোশন—যা খালি চোখে টের পাওয়া যায় না—দেখিয়ে থাকে। এতদিনে কিছুটা আশার আলো দেখা গেল, যা প্রথমে চুলচেরা সমীক্ষা মনে হলেও সূর্যের আলোকের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তখন অবশ্য টেলার সাহেবের রমরমা—তুজনে আলাদা নাম দিয়ে অনেক ঝগড়াঝাটি করলেও—কয়েক বছর বাদে এক হয়ে গেল—সত্যিকারের সায়েন্টিফিক ম্যানেজমেণ্ট।

এসব পরে আলোচনা করা যাবে। এখন দেখা যাক জিল, যার ভাল নাম গিলব্রেথ কি পেলেন? উনি বুঝলেন পাকা মিস্ত্রির কাজের ধরনটা আলাদা—তাই সহজে এতটা কাজ করতে পারে। ধরনটা সব কিছুতে এতটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে মিস্ত্রি নিজেই জানে না—অনেকদিনের অভিজ্ঞতা (এক্সপিরিয়েন্স) বলে ধরে নেয়—সাধারণভাবে তা চোখে পড়বার কথা নয়। একইভাবে কাজ করে কেউ অন্যদের থেকে ৩০ পার্শেণ্টের বেশি কাজ করতে পারে না—তফাৎটা কাজের ধরন থেকে আসছে, আপ্রাণ খেটেও নয়।

পদাতিক বাহিনী বহু পুরানো—যারা বহু লড়াই করেছে—হেসেখেলে নয় প্রাণের দায়ে, বহু রথী মহারথী ওদের চালিয়েছে—আলেকজেণ্ডার, চেঙ্গিস খাঁ, নেপোলিয়ন—তাদের নর্মাল মার্চিং স্পিড হচ্ছে ঘণ্টায় তিন মাইল। ওরা একনাগাড়ে ৫০ মিনিট হাঁটে তারপরে ১০ মিনিট বিশ্রাম। এইভাবে ওরা চলে দিনে ৩০ মাইল মার্চ করে। দরকারে খুব জোরে গেলেও ঘণ্টায় চার মাইলের বেশি নয়—দিনে ৩৫ মাইল-এর বেশি গেলে আর গিয়ে লড়াই করতে হবে না। আবার এরা যখন গা এলিয়ে আস্তে আস্তে যায়, বেড়াতে বেড়াতে যায়, তখন ঘণ্টায় আড়াই মাইল। আচ্ছা এরা যদি ১০ মিনিট বিশ্রাম না করে সমানে হাঁটতে থাকে, তবে কি ওরা বেশি যাবে? মোটেই না, বরঞ্চ দেখা যাবে কম যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দম নিলে কাজ করার ক্ষমতা বাড়ে ছাড়া কমে না।

ঘণ্টায় তিন মাইল হাঁটা হচ্ছে স্ট্যাণ্ডার্ড স্পিড—এ ভাবে চললে আপনি খুব না হাঁপিয়ে দিনে ৮-১০ ঘণ্টা হাঁটতে পারবেন—শুধু একদিন নয়—দিনের পর দিন। জোরে চললে আপনি ৪ মাইলের বেশি পারছেন না, তাও দিনে ১০ ঘণ্টার জায়গায় ৯ ঘণ্টা—তাও বেশি দিন এভাবে চলতে পারবেন না, শরীর ভেঙে পড়বে।

গিলব্রেথ পাকা মিস্ত্রির প্রত্যেকটি কাজ খুঁটিয়ে বিচার করে দেখিয়ে দিলেন কোথায় কোথায় তারা ধরনের তফাৎ করেছে এবং সেইগুলি অন্যদের শিখিয়ে দেবার পর সবাই প্রায় হেসে খেলে ১০০০ ইট গাঁথছে। প্রথমে তৈরি করলেন একটা চাকা-দেওয়া উঁচু নীচু করা যায় টেবল যাতে ইট আর মশলা হাতের কাছে থাকে যে রকমের উঁচুতে কাজ হচ্ছে তার সঙ্গে মিলিয়ে, যাতে মিস্ত্রীকে ঝুঁকে পড়ে বারবার ইট আর মশলা তুলতে না হয়, ঝোঁকা মানে শুধু শুধু বাড়তি খাটুনি।

টেলারের বোনাস নিয়ে আজকের যে এই গোলমাল, এই যে গেল গেল রব, সবাই খাপ্পা তার একটা বড় কারণ 'মেথড স্টাডি' না করে কি ভাবে কাজ করলে কাজটা সহজে হবে সেটা জানবার কোন চেষ্টা না করে বোনাস-সিস্টেম চালু করা। 'মেথড স্টাডি' মানে কি ভাবে কাজ হয় তা খুঁটিয়ে দেখে সবার থেকে সুবিধাজনক প্রথা চালু করা। একটা উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। আমাদের প্রথম সমীক্ষায় বলেছি ৫ মিনিট ধরে নিজের নাম লিখতে হয়ত লিখেছেন ২০ বার। আপনি তা না করে যদি আপনার নাম লেখা রাবার স্ট্যাম্প নেন, তবে কতবার ছাপ দিতে পারবেন? নিশ্চয় ১০০ বারের কম নয়। লেখা অবশ্য হবে না ছাপ হবে, সব ছাপ একরকমের সুন্দর দেখতে তা আস্তেই করুন আর তাড়াতাড়িই করুন। এবার দেখা যাক একজনকে বলা হল প্রত্যেক বস্তার ওপর বা প্যাকেটের ওপর আমাদের কোম্পানির নাম ঠিকানা লিখে দাও। লেখার সময় হিসেব করে দাম ঠিক হল শয়ে দশ টাকা করে। দরদস্তুর ঠিক হবার পর লোকটি পাতলা সিটের একটা স্টেনসিল কেটে নিয়েছে, কালি কলম দিয়ে না লিখে স্টেনসিলটা প্যাকেটের ওপর ফেলে তার ওপর কালির ব্রাস বুলিয়ে নামটা বসিয়ে দিচ্ছে। এতে সময় লাগবে অনেক কম, লেখা হবে সুন্দর—ভুলচুক থাকবে না—ফলে রোজগার হবে অনেক বেশি অথচ খাটুনি

খুবই কম। এবার পাশাপাশি যারা অন্য কাজ করছে, তারা লোকটার এই পাওনা সহ্য করবে কেন? তারা সারাদিন খেটে পাবে দশ টাকা আর অন্যে পাবে ২৫ টাকা তা কি করে হয়? আর মালিক যদি দেখে কোন লোক ২৫ টাকা পাচ্ছে, একই যোগ্যতা নিয়ে তবে তা দিতে রাজি হবে কেন? অন্য লোকজনকে সে কি বোঝাবে, বলবে যত সব বুরবককে নিয়ে কাজ—এদের মাথায় এই সহজ বুদ্ধিটা আসেনি অথচ এরাই হচ্ছে সুপারভাইজার-ম্যানেজার—মাস গেলে মোটা টাকা নিচ্ছে। লোকটার মতলবে বুদ্ধি দেখে খুশি, কিছু থোক টাকা দিতে চান, পুরস্কার হিসেবে, এমনকি প্রমোশনও কিন্তু কাজের রেট পাল্টাতে হবে ১০ টাকা না হয়ে হবে প্রতি শয়ে চার টাকা। ইউনিয়ন নীতিগত ভাবে রেট পাল্টাতে রাজি হতে পারে না, কিন্তু বলবেটা কি? বলবার আছেই বা কি? সারাদিন খেটে কেউ পাবে দশ আর কেউ পাবে পঁচিশ, তা কি করে হয়? ফোরম্যান যদি এখন কাজটা ওকে না দিয়ে অন্য কাউকে দেয় সেও এখন স্টেনসিল কেটে নিয়ে দিন ২৫ টাকা করে পাবে—কায়দাটা সকলের জানা হয়ে গিয়েছে—কারো তো কোন পেটেণ্ট রাইট নেই।

বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা অত সহজ হচ্ছে না। যদি আগে কারো স্টেনসিল কাটার ফন্দি মাথায় না এসে থাকে, কিভাবে কাটতে হয় তা যদি বাজিয়ে দেখে না থাকে, তবে এখন যে করেছে সে তার জন্য আলাদা কিছু তোফা চাইতে পারে; কিন্তু কাজের জন্য বেশি পয়সা চাইবে কি হিসেবে? গোড়ায় গলদ হয়েছে কি ভাবে করলে কাজটা সহজ হয়, কত রকম ভাবে লেখা যায়, কোন্‌টার কি সুবিধে অসুবিধে এ সব না ভেবে, দিলেন ছুম করে কাজের একটা রেট বেঁধে, এরপরে ওয়ার্কাররা সহজ উপায়ে কাজটা হাসিল করার বুদ্ধি বের করে বেশি টাকা পায়। তখন মনে হয় সবাই আমাকে বোকা বানাচ্ছে, বিপদে ফেলছে। মেথড গ্রুপ যদি প্রথম থেকে ঠিক করে দেয় কি ভাবে কাজ করতে হবে—তবে অত সহজে কাজ করার ফন্দি বের করতে পারবে না, এত গোলমালও হবে না, হবে না এই রেষারেষি, অথচ কাজ হবে বেশি অনেক সহজে-যা গতর খাটিয়ে করা কোন মতেই সম্ভব নয়।

একাজ এতদিন হয় নি কেন? অত সহজ কথাটা কারো মাথায় আসে নি কেন? যা হয়ে থাকে বরাবর, বাবুরা কখনও কাজ কি ভাবে করতে হয়

তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার মনে করেনি, ওটা তো মিস্ত্রিদের ব্যাপার। দরকার মত লোক লাগালেন—হেড মিস্ত্রি কাজের দেখাশুনা করবে, দিন বা হপ্তা বা মাস হিসেবে মাইনে, কে কতটা কাজ করল তার বিশেষ কোন হিসেব নেই, ফাঁকি দিচ্ছে কিনা সেটা দেখবার ভার কোরম্যানের ওপর, যতক্ষণ কাজ করছে কারও কিছু বলার নেই, কি কাজ করছে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। সময় মত কাজে এলে, হুকুম তামিল করলেই হল। মোটামুটি কতটা কাজ হবে জানা। বেশি কম খুব একটা কেউ আশা করে না। এখন হয়েছে উল্টো—রেট বেঁধে দিয়েছেন, যত কাজ তত পয়সা। এখন সবাই পয়সার জন্য ভাবতে শুরু করেছে কাজটা সহজে কত তাড়াতাড়ি করা যায়। এতদিন কেউ তাদের কাজে নাক গলাক তা কোন মিস্ত্রি পছন্দ করত না, এখনও করে না, তবে টেলার বা জিলের কথা আলাদা, তারা মিস্ত্রি থেকে বড় হয়েছে, কাজ জানে, বেশ বুদ্ধিও রাখে। কাজের মর্যাদা দিতে জানে। বাবুরা এর কি বুঝবে? তাই এতদিন হয়নি। বোনাস চালু হওয়াতে কাজের সঙ্গে পয়সার সাম্য রাখতে গিয়ে বাবুদের মাথা ঘামাতে হচ্ছে।

টেলার সাহেবের বেশি কাজ মেসিন-শপে। কিন্তু মেসিনে কাজ হলেও বেশির ভাগ সময় মিস্ত্রিকে কাজ করতে হয়। স্পিড, ফিড, কাটিং ডেক্‌ত, আপনার কথা মত দিয়েছে কিনা চেক করতে পারেন, কিন্তু হাতের কাজের সময়, যেমন জব বাঁধা, টাল ঠিক করা, টুল বাঁধা, স্পিড, ফিড বাঁধা, টুল পজিশন করা, মাপজোখ করা, টুল পাল্টান এ সব তো হাতের কাজ সেটা তো মিস্ত্রির ওপরে নির্ভর করে—এটা তো সকলের সমান সময়ে হয় না, সেখানে যত গণ্ডগোল। জিলের কাজ কিন্তু সব কিছুতে চালু করা যায়, হলও তাই। সব রকম কাজে তাকে লাগানো হল। অফিস, আদালত, ব্যাঙ্ক, হাসপাতাল, রেষ্টুরেন্ট যত রকমের কাজ আছে সবটাতেই, কারখানাতে লাগানো হচ্ছেই। মানুষের কাজ মানেই হাতে পায়ের কাজ। তাই শুরু হাতপায়ের মোসন স্টাডি। পরে এর বিস্তারিত আলোচনা হবে এখন দু-একটা উদাহরণ দিই। আগে সেলাইয়ের কল হাতে ঘোরাতে হত। এখন ভাবা হল পা কিছু না করে বসে আছে, পা দিয়ে চালালে তো দুহাতে আরো তাড়াতাড়ি কাপড় সামলান যায়, কাজ হয় তাড়াতাড়ি। এর পরের ধাপে অবশ্য মোটর দিয়ে।

কতটা একটা লোক করতে পারে, আর কোন্ কোন্ শরীরের অংশ কি ভাবে কাজে লাগান যায় ; তার উদাহরণ হচ্ছে বাসের ড্রাইভার। সে সমানে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে আর দেখছে কোন্ গাড়ি, কোন্ দিকে যাচ্ছে। কোন্ লোকটা বাসে ওঠার জন্য হাত তুলছে, কোন্ লোক কত জোরে রাস্তা ক্রস করছে (পার হচ্ছে), কে ছিট্‌কে রাস্তায় এসে পড়তে পারে ? আয়নায় দেখছে পেছনের গাড়ি কি করতে চাইছে, হাত দুটি ষ্টিয়ারিংএ ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাচ্ছে, আবার হাত দিয়ে হর্ন টিপছে, সময়মত গিয়ার পালটাচ্ছে, হ্যাণ্ড-ব্রেক লাগাচ্ছে, সব কিছুই না তাকিয়ে যেমন আমরা ভাত খাই সেই রকম অথচ সামনের দৃষ্টি সজাগ। আর পায়ের ওপর ভার পড়েছে ক্লাচ, ব্রেক আর অ্যাকসিলেরেটার টেপার। একটুকু ভুলচুক হবার যো নেই। তাহলেই অ্যাকসিডেন্ট ; এরপরে অ্যাকসিডেন্টের হাত থেকে বাঁচলেও অন্যদের হাত থেকে বাঁচবে কিনা সন্দেহ।

কষ্টিং—দামের হিসেব

হেনরি ফোর্ডের নাম শুনেছেন। যিনি দুনিয়াকে চাকার উপর বসিয়েছেন, নামকরা ফোর্ড গাড়ির জনক, যা একসময় সব বাজার জয় করেছিল। ফোর্ডের থেকে সস্তায় অত ভাল গাড়ি করতে কেউ পারেনি। উনিই প্রথম চালু করেন 'মাস প্রোডাকসন', লাইন বেঁধে তৈরি করা, 'মেথড স্টাডি' 'মেশিন স্টাডির', চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন। প্রতি মিনিটে কারখানা থেকে একটি করে মোটর গাড়ি বেরোচ্ছে। চার্লি চ্যাপলিনের মডার্ন টাইম সিনেমা তো এই রকম কাজের ব্যঙ্গচিত্র—সামনে দিয়ে কাজ এগোচ্ছে, তোমার ওপর ভার পড়েছে কতগুলি বল্টু টাইট করার। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘড়ির কাঁটার মত বল্টু টাইট করে চলেছ। ফাঁকি দেবার কোন উপায় নেই। অনেকটা মাল তোলা-নামানোর কাজ বা মাটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ। প্রত্যেককে কতটা দূরত্ব নিয়ে যেতে হবে ঠিক করে দেওয়া আছে। তোমার কাজ তারই একমাথা থেকে নিয়ে অন্য মাথায় আর একজনকে দেওয়া আর নিজের জায়গায় ফিরে আসা। শেষ মাথায় যদি দেখা যায় মিনিটে একটা করে মাল আসছে তবে নিশ্চয় এই শিকলের সব লোকই কাজ

করছে। যদি দূরত্বটা, এক মিনিটে যতটা গিয়ে মাল বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে আসা যায় সেই হিসেব করে দেওয়া থাকে তবে জানতে হবে সকলে সমান ভাবে কাজ করছে। সেইজন্যই ফোর্ডের কারখানার মাইনে যে কোন কারখানা থেকে ২৫% বেশি, অথচ গাড়ির দাম কম, গুণেও ভাল।

ফোর্ড সাহেব প্রবাদ-পুরুষ, ওনার নামে সত্যি মিথ্যা কত রকমের গল্প চালু, যা পষ্টাপষ্টি কথা বলেন। তারই একটা গল্প শুনুন—"কোটি কোটি টাকার কাজ করছেন—কয়েকজন অ্যাকাউনট্যাণ্ট রাখুন—পয়সার হিসাব রাখবে, কোথায় পয়সা যাচ্ছে তা বুঝতে পারবেন, এই পরামর্শের উত্তরে একটু হেসে হেনরি বললেন, দেখেছ আমার পকেট। যা আসে এই পকেটেই আসে আর যা দরকার আমিই তা এই পকেট থেকে খরচ করি, বাকি যা রইল তা আমার। হিসেব করে কি হবে, পকেটের টাকাটা কি বাড়বে? খরচাও কি কমবে? মাঝখান থেকে অ্যাকাউনট্যাণ্টদের মাইনে গোন। এটারহিসেব ওটার হিসেব প্রতি পাই পয়সার হিসেব, যত সব ঝুট ঝামেলা। আমার টাকাতো আর খোলামকুচি নয়, বাজে খরচ করতে পারব না।" কথাটা ওঁর মুখেই সাজে, সামান্য সাইকেল মিস্ত্রি থেকে এত বড় হয়েছেন, নিজের বুদ্ধির জোরে আর সমানে খেটে—অগাধ টাকা, সম্পত্তি, আর প্রতিপত্তি দেশে বিদেশে। বড় ছেলে স্কুল থেকে বেরোলে বললেন 'কলেজে গিয়ে কাজ নেই ওখানে কিইবা শেখাবে বরং আমার সাথে কারখানায় চল হাতে নাতে সব কিছু শিখে পড়ে নাও। দুনিয়ার সবাই এখানেই আসে কাজ শিখতে।'

এর পঁচিশ বছর পরের কথা—নাতি নাকি কলেজে পড়বে—কাজ শিখতে যাবে জেনারেল মোটরে—ওনার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে। তিনি তো রেগেই আগুন, এ হতে পারে না, এ অপমান আমি কিছুতেই সহ্য করব না। কথা না শুনলে সবাইকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করব—এক কানাকড়িও কেউ পাবে না। ছেলেও গোঁ ছাড়বে না, বাপকা বেটা তো, কিছুদিন পরে বাবার রাগটা পড়ে যাবে। সম্পত্তি তো আগে থেকেই উনি সব ছেলে মেয়ে, বউ, নাতি নাতনিদের মধ্যে ভাগ করে দানপত্র লিখে দিয়েছেন আর বিরাট একটা অংশ দিয়েছেন ফোর্ড ট্রাস্টকে, যার ট্রাষ্টি হচ্ছে ওরাই। এখন তো আর তা ফেরাবার উপায় নেই। মজা হচ্ছে উনি একদিকে আর বাদবাকি সবাই অন্যদিকে। বন্ধুরা বোঝাল "দাও না বাপু ছেলেদের হাতে সব ছেড়ে, ওরা যা

ভাল বোঝে তাই করুক। তুমি বরং একটু ধর্মকর্ম কর—তোমার অগাধ টাকার ট্রাস্ট কি ভাবে কাজ করছে দেখ, তুমি আর ব্যবসার মধ্যে মাথা গলিও না।" বুঝুন ব্যাপার, বউ ছেলে মেয়েরা মিলে বাপকে তাড়াতে চায়? এরা সব ক্ষেপে গেল নাকি?

না ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। এতদিনে ফোর্ড কোম্পানির আগের অবস্থা আর নেই। বাজার এখন জেনারেল মোটরের হাতে—একাই বাজারের ৬০ ভাগ দখল করে বসে আছে। ওদের বাড় বাড়ন্ত, আর ফোর্ড একপা একপা করে পেছিয়ে এসেছে। জি. এম. ফোর্ডের এককাঠি ওপরে গেছে, যে মেথড স্টাডি শুধু কাজের বেলায় প্রয়োগ করা হয়েছিল জি. এম. তা টাকার বেলায় শুধু নয় আরো অনেক কিছুতে প্রয়োগ করেছে। লোকের বেলায়, তার হাত নাড়া আর পা নাড়া দেখব, প্রতি মিনিটে কি কাজ হচ্ছে তার হিসেব করব, অথচ টাকার বেলায় থোক হিসেব তা কি করে হয়? সেখানেও সব কিছু খুঁটিয়ে দেখতে হবে. কোন্ কাজে কত খরচ হচ্ছে, কোন্টাতে কত লাভ হচ্ছে, কোন মেসিনে কত লাভ হচ্ছে। প্রতি পয়সা খরচ করার সময় তা থেকে কি আশা করা যায় আর কতটা আসছে সব হিসেব রাখতে হচ্ছে। দস্তুর মত চুলচেরা হিসেব। এটা যে কত দরকার ফোর্ড তা বুঝতে চান না—এতদিন তো বেশ চলছিল আজ আবার কেন সব উল্টে যাচ্ছে। সকলে মিলে ওঁকে কস্টিং এর দরকার বোঝাতে চাইছে।

থাউকো হিসেবে আধুনিক শিল্প চলে না। তারা সবকিছু ভাগ ভাগ করে দেখছে। শিল্পের আছে নানা ডিভিসন, প্রতি ডিভিসনে আছে নানা সেকসান, সেখানে কাজ করছে কতকগুলি দল আর প্রতি দলে কাজ করছে কয়েকজন লোক। শিল্পকে লাভে চালাতে হলে প্রতিটি অংশের প্রতিটি লোকের দায়িত্ব আছে, সেসব তাদের নিতে হবে, অন্যে কেন নেবে? প্রতিটি লোককে বুঝিয়ে দিতে হবে, কি তার কাছ থেকে আশা করা হচ্ছে। বুদ্ধি বেশি দিতে হবে না—দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে—নতুন কিছু করতে চাও তো বলতে হবে, কত খরচা করতে হবে, কি তাতে পাওয়া যাবে—কতদিনে টাকাটা উঠে আসবে—আন্দাজে বলছেন না কিছুর ওপর নির্ভর করে বলছেন—দায়িত্ব কতটা কে নেবে, এসব না বললে কোন কাজে হাত দেবার কথাই ওঠে না। কোম্পানি অনেক লাভ করছে সুতারাং দুচারটাতে

ক্ষতি হলে কি আসে যায়—একথা বলা চলবে না। আমাদের জানতে হবে কেন ক্ষতি হচ্ছে, কার জন্য এই ক্ষতি—আর ক্ষতি হলে সেটাকে চালাবার দরকারটাই বা কি? কোন্ লোকটা কাজের কে অকাজের এতেই বোঝা যাবে। ওদের কয়েকটা সহজ নিয়ম নিচে দিচ্ছি—

১. টাকা নিলেই, যতদিন না ফেরৎ দিচ্ছেন বাজার দরে তার সুদ দিতে হবে, সে টাকা ধারই করুন বা নিজের পকেট থেকে দিন কিংবা অন্য কেউ দিয়ে থাকুক। সে টাকাটা আপনি কাজে লাগান বা নাই লাগান। আজকে সুদের বাজার দর বছরে ১৫ শতাংশ।

২. টাকা দিয়ে যদি কোন যন্ত্রপাতি কেনেন, তবে সুদ ছাড়াও তার (খয়ে যাওয়ার বা পুরোনো হবার) দাম দিতে হবে—তা ছাই আপনি ব্যবহার করুন বা নাই করুন, চালান বা নাই চালান। এটা জিনিস বুঝে বছরে ৫ থেকে ২৫ শতাংশ হয়ে থাকে, সাধারণত ১০ শতাংশ।

৩. লোক রাখলে তার বাৎসরিক প্রাপ্য মেটাতে হবে, তা তাকে দিয়ে কাজ করাতে পারেন আর না পারেন—'কাজ নেই পথ দেখ' সেদিন ফুরিয়ে গেছে—পছন্দ হচ্ছে না, মুখের কথায় ছাড়ান চলবে না।

৪. কাওকেও বেগার খাটান চলবে না, তা সে মালিক বা অন্য কেও হোক। মালিক যদি কাজ করে, তা সে যত কমই হোক, সে কাজের দাম ধরে দিতে হবে—দয়া দাক্ষিণ্য চলবে না।

৫. আনুষঙ্গিক খরচ—যথা ঘর ভাড়া অফিসের লোকজনের মাইনে, যা কিছু আপনার কাজে লাগাচ্ছেন তার দাম, ঐসব ধরে দিতে হবে হিসেবের জন্য—'আমার বাড়ি ভাড়া নেব না' 'আমি সুদ চাই না'—যদি বলেন তাহলে তার জবাব হবে,—'বেশত টাকার দরকার নেই আপনি ফেলে দিন, দান করুন, যা প্রাণ চায় তাই করুন'—কিন্তু যে ব্যবসা করছে তাকে বুঝতে দিন সে কত কি পাচ্ছে—কতটা দায়িত্ব তার উপর—কত টাকা খরচ করে কি লাভ সে করছে—কতটা সে কাজের।"

৬. অনেক সময় অল্প টাকার বেলায়—ছোটখাট কিছু হলে, এত সব না করে অন্য ভাবে হিসেব করা হয়, যেমন দু'বছরে টাকাটা উঠে আসবে অথবা যোগানের বেলায় বলা হয় যেমন ২০০ টা কাজ করলে যোগানের খরচ উঠে আসবে।

৭. এই সব খরচ-খরচা বাদ দিয়ে যা থাকবে তাই আপনার লাভ। টাকার সুদটা লাভ নয়, কারণ ব্যবসা না করে টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখলে কম করে ১০ শতাংশ সুদ পেতেন। যে সুদটা কিছু না করে পাওয়া যায় তা পাবার জন্য ব্যবসা করছেন তা কি করে বলবেন? সেই রকম আপনি যদি কাজ করেন তবে অন্য কোথাও কাজ করলে আপনি যা রোজগার করতেন তা আপনি নেবেন নাই বা কেন? এই টাকাটা পাচ্ছেন খাটুনির জন্য, ব্যবসা করার জন্য নয়।

স্ব-পরিচালিত সব শিল্পেই তাই প্রতিটি বড় মেসিনের প্রতি ঘণ্টার দর, প্রতি ফিটারের প্রতি ঘণ্টার দর, সব কিছু আলাদা ভাবে হিসেব করা আছে, যাতে খরচের হিসেব আর দামের হিসেব আর কত পেলাম তা সহজেই বোঝা যায়। সে রকম প্রতিটি লোকেরও আয়-ব্যয়ের হিসাব থাকে।

আমি তো অনেক কিছু বললাম, কি যে বললাম, আর তা কতটা কি একটা হিসেব করে দিই। কোন এক শিল্পের এই সমস্ত জানা আছে—

১. প্রোডাকশন ওয়ার্কার—মাসে মাইনে বাবদ খরচ—১০০,০০০ টাকা

২. দারোয়ান, ক্যান্টিন ওয়ার্কার, ড্রাইভার, অফিস স্টাফ, অফিসারের মাইনে, ঘর ভাড়া, ইলেকট্রিসিটি, টেলিফোন ইত্যাদি সব মিলিয়ে—লোক আছে—৬০—মাসে খরচ—৮০,০০০ টাকা। কাজ হয় এক সিফট—সপ্তাহে ৪৮ ঘন্টা—রবিবার আর অন্য সব ছুটি বাদ দিয়ে কাজ হয় বছরে ২৭০ দিন—মাইনে ছাড়া পাওনা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুয়িটি, বাৎসরিক বোনাস, ক্যাজুয়াল লিভ, ই. এস. আই. ইত্যাদি, তা গড়ে আসছে মাইনের ৩০ শতাংশ। লেদমেনের মাইনে যা মাসের শেষে দেওয়া হয়—ডি.এ., ঘরভাড়া সব মিলিয়ে ৫০০ টাকা।

প্রশ্ন: যদি কোন লেদের দাম হয় ১০০,০০০ টাকা, সেটার প্রতি ঘণ্টার দাম কত?

(ক) সুদ, ক্ষয়, মেরামতি ১৫%, ৭%, ৩% সব মিলিয়ে বছরে ২৫ শতাংশ	অর্থাৎ—	২৫,০০০ টাকা
(খ) মিস্ত্রির খরচ ৫০০×১২×১·৩—	বছরে	৭,৮০০ টাকা
(গ) ওভারহেড বা আনুষঙ্গিক (২ দেখ)	'খ' এর ৮০%	৬,২৪০ টাকা
	বছরে মোট	৩৯,০৪০ টাকা

বছরে কাজ হয় ২৭০ দিন × ৯ ঘণ্টা হিসাবে রোজ × ০·৮% (ঠিক যতটা কাজ করা যায়)—চা খাওয়া, বাইরে যাওয়া, তৈরি হওয়া বাদে। সত্যিকারের কাজ হবে বছরে ১৯৪৪ ঘণ্টা, প্রতি ঘণ্টার দাম পড়বে ২০ টাকার মত। দামি মেসিন হলে দামও পড়বে বেশি, আর সস্তার মেসিন হলে কম।

এই রকমভাবে হিসেব করুন মিনি বাসের দৈনিক কত ভাড়া পড়া উচিত বা বাসের কত ভাড়া হওয়া উচিত আর তা বাজার দরের সঙ্গে যাচাই করুন।

প্রেরণা : মোটিভেশন

আমরা কাজ করি কেন? সাধারণভাবে বলতে গেলে টাকার জন্য, যা দিয়ে আমাদের খাবার, কাপড়, বাড়ি সোজা কথায় আমাদের অভাব মেটাতে পারি। কাজের সব থেকে বড় প্রেরণা পেটের দায়—যা দিয়ে বনের পশুকেও পোষ মানানো যায়। চাই না চাই পেটে আগুন জ্বলছে—খিদে পাচ্ছে আর তার জন্য আমাদের ছুটোছুটি করতে হচ্ছে। এর হাত থেকে কোন প্রাণীর নিস্তার নেই। কিন্তু পেট যার ভরা আছে সে কাজ করে কেন? কথাটার উত্তর সবার কাছে সমান আশা করবেন না—বাঘ সিংহ পেট ভরলে আর শিকার করে না, অন্যদিকে ইঁদুর মৌমাছি আগে থেকেই দুঃসময়ের জন্য খাবার জমাচ্ছে—মানুষের বেলায়ও তাই, সব মানুষ টাকা জমাতে চায়, যাতে সাত পুরুষ বসে খেতে পারে অথচ আদি-বাসিদের দেখুন বাড়িতে চাল থাকলে সে আর কাজে যেতে রাজি নয়। আমাদের যে শুধু পেটের খিদে আছে তা নয়, আছে নানা রকমের অভাব —অভাব সব সময়ে দৈহিক কারণে হয় না—সামাজিক জৈবিক কারণও আছে, যার কোন সীমা নেই—পাশাপাশি আছি, ওরা যে রকম ভাবে থাকছে, খাচ্ছে আমার তা না করলে চলে না। গ্রামে আমি যে ভাবে থাকতে পারি, কলকাতায় সে ভাবে থাকা ঠিক সম্ভব নয়, আবার আমেরিকায় গেলে তাদের মত করে থাকতে না পারলে মানসিক কষ্ট হবে। আমাদের কাজ করে রোজগার করতে হবে এই অভাব মেটাবার জন্য। আবার কেও কেও কাজ করে কাজ করার আনন্দে—সম্মানের জন্য, তাদের অবশ্য প্রথম দুটো অভাব আগেই মিটেছে—ও দুটো কিছুটা না মিটলে অন্য প্রেরণার জোর

খাটে না। আমি অবশ্য আমার হিসেব থেকে সাধু, ফকির, ভণ্ড আর নেতাদের বাদ দিয়ে দিয়েছি—তাদের বেলায় আমার কথা খাটে না।

টাকাটা নানাভাবে রোজগার করা যায়। আমরা অসামাজিক উপায়ে রোজগারের কথা বলছি না—সামাজিক উপায়ে রোজগারের কথা বলছি। সবাই যখন একই সমাজে থাকে না, তখন তাদের উপায়ের মধ্যে কিছুটা ফারাক থাকবে, যেমন—নানারকম সামাজিক নিয়মে আছে। কিছুটা আমরা সকলেই অন্যায় বলে স্বীকার করি—আবার কিছুটা অন্যায় ভাবলেও জোর দিয়ে বলি না—যেমন ঘুষ খাওয়া—কালো বাজারি—ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়া ইত্যাদি। অনেকে অবশ্য কাজ না করেই কিছু না কিছু রোজগার করেন—যেমন ধরুন টাকার সুদ, বাড়ি ভাড়া, ডিভিডেণ্ড।

কাজে উৎসাহ যদি আশা করি তবে কাজের সঙ্গে টাকার একটা সম্পর্ক থাকা চাই—কতটা কাজ করলে কত টাকা পাবে, কি রকমের কাজে কত টাকা পাওয়া যাবে। সারাদিন খেটে যদি দুটাকা পাওয়া যায় তবে কাজে উৎসাহ আসবার কথা নয়। কতটা কাজ করলে কতটা ন্যায্য পাওনা হবে, সেটা অবশ্য নির্ভর করে দেশের ওপর, একই কাজে আমাদের দেশে যা মাইনে তার দশগুণ পাওয়া যায় মিডল ইষ্টে বা আমেরিকায়।

এক দেশে কাজ করলে সে কথাটা আর আসে না—একই কাজ করে যদি অন্য লোকে বেশি মাইনে পায় তবে আপনি সেই কাজে উৎসাহ পাবেন কেন, প্রত্যেকের মাইনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা চাই। তা না হলে অসন্তোষ বাড়তে বাধ্য। আমি কাজের কথাই বলছি, ডিগ্রীর কথা বলছি না। আবার তেমনি যদি আপনার অনেক কোয়ালিফিকেশন থাকা সত্ত্বেও যদি উপযুক্ত কাজ না পান তবে কাজে উৎসাহ পাবেন না। এখানে অবশ্য যে আপনাকে কাজে নিয়েছে তার কিছু করার নেই।

এছাড়া আর একটা জিনিস আজকাল খুব বেশি করে দেখা দিয়েছে, সেটা হচ্ছে লোকের আত্মসম্মান-জ্ঞান, কোন কিছু না বুঝিয়ে শুধু হুকুম চালালে, কেউ সেটা মানতে চাইবে না। কি হচ্ছে, কেন করা হচ্ছে, তার সম্বন্ধে সে একটা ধারণা করতে চায়। সবটা বুঝলে সে কাজ অনেক ভাল ভাবে করতে পারবে। 'অতশত তোমার জানবার দরকার নেই যা বলছি তাই কর' এতে কর্মীর বিচারবুদ্ধির ওপর আঘাত লাগে, সেটা

কেউই মেনে নিতে চাইবে না। আর শুধু শুধু কাজ করতে—যেটার কোন দরকার নেই—সে রকম কাজ করতে, সে চাইবে না। অনেক কিছুর লোভ দেখালেও সে যা অন্যায় মনে করে তাকে দিয়ে তা করাতে পারবেন না।

যতই আমরা না বলি না কেন—মানুষ সামাজিক জীব, অন্যের ভালবাসা, নিজের প্রতিষ্ঠা দশজনের মন জুগিয়ে চলা তার স্বাভাবিক ধর্ম। টাকা দিলে সব কিছু কেনা যায়, এটা ঠিক নয়। চুকলি কাটা সে মোটেই পছন্দ করে না। 'তোমাদের মধ্যে কে অন্যায় করেছ বল' বললে যে অন্যায় করেছে সে হয়ত নিজের নামটা বলতে পারে—কিন্তু ও করেছে বলে সে অন্য কাউকেও দেখাবে না। টেলর সাহেব প্রথম দিকে সেটা ঠিক বুঝতে পারেন নি। 'টাকা দিচ্ছি যখন কোন কথা না বলে অন্যের মুখের দিকে না তাকিয়ে খাটবে' সেটা ধরে নিয়েছিলেন; কিছুদিন পরেই বুঝতে পারলেন নিজের ভুল।

সিনিয়রিটির ওপর লোকে এখনও যতটা জোর দেয় কাজের এফিসিয়েন্সির ওপর ততটা জোর দেয় না, আমাদের সমাজ বরাবরই যারা বয়সে বড় তাদের মানতে, সম্মান দিতে শিখিয়েছে, তার গুণ বিচার করতে আমরা ততটা রাজি নই। আমরাও তাতেই অভ্যস্ত, এর থেকে কিছু অন্যথা হলে—কেউই ঠিক খুশি হবে না, এমন কি যার সুবিধে করে দেওয়া হয় সেও মানতে রাজি নয়।

খুব কম কাজই ঠিক একজনের দ্বারা হয়, বেশির ভাগ কাজেই দরকার হয় সমবেত প্রচেষ্টা, কোথাও তারা সোজাসুজি সাহায্য করে—কোথাও তাদের অবদান ঠিক চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। ওদের কাজ চোখে পড়ে তখনই যখন তারা কাজে বিরত থাকে বা ধর্মঘট করে, বা কাজে বাধা দেয়। ফুটবল টিম কি একজনকে দিয়ে হয়? প্লেয়ার যদিও খেলতে নামছে মাঠে তবুও কোচের অবদান আপনি নিশ্চয় অস্বীকার করবেন না। ক্লাবের কর্মকর্তা—ইলেকশন যে কতখানি মূল্যবান তা সব ক্লাবের মেম্বার ভাল ভাবেই জানে। এরাই তো কোচ, প্লেয়ারস আর টাকা পয়সার বন্দোবস্ত করে। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজে, শুধু কে এফিসিয়েন্ট, বা কে তত সুবিধের নয় তার উপর বেশি জোর দিলে, সহযোগিতা অপেক্ষা প্রতিযোগিতা বেশি আসতে পারে, তার ফলে রেষারেষি—নীট ফল—প্রোডাকশন কম,

ভালোর থেকে খারাপ বেশি, তাই লোকে যেটুকু মানতে অভ্যস্ত তার থেকে বেশি প্রতিযোগিতা বা রেষারেষি কোন মতেই চালু করা উচিত হবে না। তাও আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ অবস্থায়।

বেশির ভাগ জায়গায় প্রথমে যাচাই করে লোক নেওয়া হয়। এটাই আশা করি যাদের আমরা নিয়েছি তারা তাদের সাধ্যমত কাজ করবে, যদি না করে তবে প্রবেশনারি পিরিয়ডের পর তাকে কনফার্ম করার দরকার কি? কনফারমেশনের কয়েক বছর পরে আসে এফিসিএন্সি বার, তার আগে পর্যন্ত রেগুলার ইনক্রিমেণ্ট, মাঝখানে কাউকে ঠিক কাজের জন্য বিশেষ কিছু দেওয়া হয় না। প্রমোশন প্রায়ই আলাদা সিলেকশনের বেসিসে হয়, কনফিডেনসিয়ল রিপোর্টের ভিত্তিতে শুধু নয়। তাও প্রায় প্রথম দিকে নয়—বেশ কয়েক বছর পরে। এই নিয়মটা সব দেশেই প্রায় সমান ভাবে প্রযোজ্য—সব শিল্পেও মোটামুটি তাই ঘটে, এটা বিশেষ করে মনে রাখতে হবে সাময়িক কাজের ভিত্তিতে যদিও কিছু দেওয়া যায়, সাময়িক কাজের ভিত্তিতে মাইনে কমানো প্রায় অসম্ভব। আমাদের দেশে কেন প্রায় সব দেশেই ডিমোশন করার উপায় নেই—গতি একমুখো; তাই প্রমোশন সিলেকশন খুব খুঁটিয়ে ভেবে চিন্তে করতে হবে, না হলে তাকে না পারবেন গিলতে না পারবেন হজম করতে।

সংগঠন

কেউ যদি একা একা তার নিজের মত, নিজের সুবিধে মত, যতটুকু ইচ্ছে যে ভাবে ইচ্ছে কাজ করতে পারে তাতে কারো কিছু বলার নেই। আপনার মোড়ের পান-বিড়ির দোকানের কথাই ধরুন, যখন ইচ্ছে খুললো, খোলা দেখতে পেলেন তবে কিছু কিনলেন, বন্ধ দেখলে অন্য যায়গায় গেলেন। কারো কিছুই বলার নেই, অথচ দেখুন তার দোকানটা রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকে, আপনি কিরকমের সিগ্রেট খান তাও মনে রেখেছে, খাতির-যত্ন করেই কাজ করে। তাকে কিছু বলতে হয় না, সে জানে এতেই তার সংসার চলে, না চালাতে পারলে কপালে ভাত জুটবে না। মনোহারি দোকানও প্রায় তাই। এরা স্বনিযুক্ত, এদের কাজ স্বনির্ভর বা সেল্ফ এমপ্লয়েড। বেশির

ভাগ লোক এই করেই সংসার চালায়। ডাক্তার, উকিল, কুলি, মজুর, রিক্সাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, নাপিত, মুচি, গ্রামের চাষী, কামার, কুমোর, জেলে, জনমজুর, ঝি চাকর, প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ লোক এর আওতায় পড়ে। এরা সবাই আত্মনির্ভরশীল, স্বনিযুক্ত।

এবারে দেখা যাক দোকান বেশ চালু হয়েছে, খদ্দেরকে আপনি একা সামাল দিতে পারছেন না, একজন সহকারী দরকার। তখন ব্যাপারটা অন্য রকম ভাবে দেখা দেবে। তখন আপনাকে দেখতে হবে,সহকারী বিক্রির টাকাটা ঠিক ক্যাশ বাক্সে জমা দিচ্ছে কিনা, জানাশুনা লোকের থেকে কম দাম নিয়ে দামী জিনিস দিচ্ছে না তো ? বা কোন লোককে ঠকিয়ে বাড়তি পয়সা পকেটে পুরছে না তো ? কোন জিনিস হাতিয়ে নিচ্ছে না তো ? হাজার রকমের সন্দেহ, হাজার রকমের প্রশ্ন। এর ওপর আছে তার কাজের সময় বেঁধে দাও, ছুটিছাটা, মাস গেলে মাইনে, তা বিক্রি হোক্ আর না হোক। অনেকেই এই উট্‌কো ঝামেলা নিতে রাজি হয় না বা তা সামলাতে পারে না। বড়জোর দরকার হলে নিজের ভাইকে বা ছেলেকে আসতে বলে, যে এক সংসারে আছে। কেউ কেউ অবশ্য সবসময় দোকানে নিজে বসে আছে বা একই সঙ্গে কাজ করছে, পয়সাটা নিজের হাতেই নেয়, কেনাকাটা নিজেই করে, অপরের ওপর ভরসা করতে পারে না। নিজে যেতে না পারলে দোকান বন্ধই রাখে। একজনে যতটা বিক্রি করতে পারত তার ডবল কিন্তু দুজনের দ্বারা বিক্রি হয় না। তাহলে কথা হচ্ছে, কেন দুজনে একটা দোকানে কাজ করছে। কই পানের দোকান তো দুজনে মিলেমিশে করে না ? বেশি লোক একসঙ্গে কাজ করার একটা প্রধান কারণ টেকনিক্যাল, অনেক কাজ আছে যা ঠিক একা করা যায় না। যেমন বাস, একজনে চালাবে টিকিট কাটবে সেটা সুবিধের হয় না, একজন ড্রাইভার আর দুজন কণ্ডাক্টার্ থাকলে সুবিধে। সেই রকম নিয়ম নৌকার বেলায়ও খাটে। সেখানে নিজেদের স্বার্থে সকলকেই মিলেমিশে কাজ করতে হয়। বড় কাজ মাত্রই সেই নিয়মে চলে। শিল্প আর নানা রকমের ব্যবসা-বাণিজ্য সেইভাবে চলছে। আমরা আর সেকালের মত গুরু গৃহে গিয়ে একজনের কাছে পড়ি না, বরং নানা মাস্টারের কাছে নানা বিষয়ে শিক্ষা নিই, সকলে সব বিষয় সমানভাবে পড়াতে পারে না, আর

আজকাল আমরা মোটামুটি ধারণা করতে রাজি নই। বেশ ভাল ভাবেই শিখতে চাই। ব্যাবসা করতে হলে কাজ শিখতে হবে। তাই কাজ শেখার জন্য দোকানে কাজ করি, আরেকটা কারণ, সবার তো টাকার জোর নেই, তাই আরেক জনের হয়ে কাজ করতে হয়। যার কাছে কাজ করব সে যদি কিছু সুবিধে না পায় অত হাঙ্গামা নেবে কেন।

যখনই অনেক জন মিলে কাজ করি তখন কে কি কাজ করবে, কে কাজটা বুঝিয়ে দেবে এবং কাজটা ঠিক মত হয়েছে কিনা বুঝে নেবে, কার কোন্টা দায়িত্ব কতটা দায়িত্ব, তাছাড়া কিভাবে কাজ করতে হবে, কোন্ সময়ে করতে হবে এ সমস্ত বলে দেওয়া দরকার এবং যাতে কারো বুঝতে কোন অসুবিধে না হয়, তার জন্য সেটা লিখিত ভাবে জানিয়ে দেওয়া দরকার, ক্লাস রুটিনের মত।

সংগঠনের অনেক সময় চার্ট করে দেওয়া হয় বলে তাকে অর্গানিজেশন চার্ট বলে। স্বষ্ঠু ভাবে কাজ করতে গেলে এটা খুবই প্রয়োজন। কথাটা হচ্ছে কতটা খুঁটিয়ে সেটা করতে হবে? শুরুতে একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া হত, অনেক সময় কাজ করতে করতে একটা ধারণা হয়ে যেত—যেমন আমরা মিস্ত্রিকে কি করতে হবে বলেই খালাস, বাদ বাকিটা ওর জানা আছে সেইভাবে করবে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কোন্ সময়ে কি ভাবে কোন্ যন্ত্রপাতি নিয়ে, কত সময়ে কাজটা করবে তাও বলে দেওয়া হয়—তা বলে কিভাবে টুল বাঁধবে, কখন টুলকে ধার দিতে হবে সেটা মিস্ত্রির ওপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য যখন জানা আছে তখন বুঝে-সুঝে বাদবাকিটা তাকেই ঠিক করে নিতে হবে। যেমন আগেকার দিনে রাজা রাজড়া দেশ ভাগ করে এক একটা অংশ এক একজনের হাতে ছেড়ে দিতেন, কথা থাকত তুমি বছরে এতটা রাজস্ব দেবে, যুদ্ধের সময় এত সৈন্য দেবে, মাঝে মাঝে এসে দেখা করবে, বাদবাকিটা তুমি যা ভাল বোঝ কর, সেটা তোমার ওপরেই ছেড়ে দেওয়া আছে। ভালভাবে চালাতে না পারলে রাজা যা ভাল বোঝেন তাই করবেন। এই করে এক সময়ে বেশ চলে যেত, এখন আর তা চলে না। যাতে ভালভাবে কাজ হয় তার জন্য দেশরক্ষা বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ এরকমের অনেক ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, পুলিস ধরতে পারবে, বিচার করবেন জজ সাহেব, হাতে নাতে

ধরলেও সাক্ষীসাবুদ আনিয়ে সেটাকে প্রমাণ করাতে হবে, তবেই শাস্তি, তার আগে নয়। এটা অবশ্য একদিনে হয়নি, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনেক যুগের এক্সপিরিয়েন্স দেখে তবেই এটা করা হয়েছে।

আমরা তো আর রাজত্ব চালাচ্ছি না, ছোটখাট কাজ করছি। তাতে কে কি করবে সেটা যেখানে বলে দেওয়া নেই তখন মূল উদ্দেশ্য যাতে সিদ্ধ হয় সেটা ভেবে কাজ করার দায়িত্ব যার ওপরে ভার দেওয়া হয়েছে তার ওপরে বর্তাবে। পুরো কাজটার মধ্যে কোথাও ফাঁক থাকবে না। এখন ধরুন কারো ওপর ভার পড়েছে রাস্তা পরিষ্কার রাখার, আমাদের ওপর ভার পড়েছে বাড়ি পরিষ্কার রাখার। সকালে ৬টায় যদি ঝাড়ুদার রাস্তা পরিষ্কার করে যায়, আর আমি যদি সকাল সাতটায় বাড়ির আবর্জনা সব রাস্তায় ফেলি তবে সারাদিনই তো রাস্তা নোংরা থাকবে। কাকে আপনি দায়ী করবেন? কেউ তো কাজে ফাঁকি দেয়নি। তখন নিশ্চয় আপনি বলতে পারেন অতশত আমি বুঝি না, জমাদার রাখা হয়েছে রাস্তা পরিষ্কার রাখার জন্য, সে এতটার সময় এসে কাজ করবে, বাড়ির জঞ্জাল তার কিছুটা আগে বালতিতে করে বাইরে রাখতে পারেন বা ডাস্টবিনে ফেলে আসতে পারেন, যখন খুশী তখন রাস্তায় ময়লা ফেলা চলবে না। এসমস্ত যদি লিখিত পড়িত ভাবে বলতে হয় আর পুলিস লাগিয়ে দেখতে হয় তবে বলব আমাদের সিভিক্ সেন্সের অভাব আছে—আমাদের কাণ্ডজ্ঞানের অভাব। যেহেতু রাস্তা সরকারি তাই বলে কেউ যদি তার বাড়ির জঞ্জাল আপনার দোরগোড়ায় এনে ফেলে আর নানাপ্রকার কূটতর্ক করে, কি করতে হবে বা কি করা ঠিক আপনি নিজেই স্থির করুন। এইসব নিয়ে যদি কোর্ট-কাচারি করতে হয় তবে সভ্য সমাজে বাস করা চলে না। নিজেদের মধ্যেই এর ফয়সালা করতে হবে।

এসব নিয়ে একটা মজার গল্প চালু আছে—রামবাবু মাস তিনেক ছেলের কাছে বাইরে কাটিয়ে পেনশন আনতে গেছেন—তিন মাস পেনশন পাননি—যিনি এটা নিয়ে দেখাশুনা করেন বললেন, আপনি যে বেঁচে আছেন তার প্রমাণ এনেছেন কি? "সামনে দাঁড়িয়ে জলজ্যান্ত আমি, পাঁচ বছর ধরে একই অফিস থেকে পেনসন নিচ্ছি—সেই আমি বেঁচে আছি কিনা তার প্রমাণ দিতে হবে?" অনেক তর্কাতর্কি—আপনি আমাকে পাঁচ বছর ধরে

দেখছেন, ভালভাবেই চেনেন, এসব কি বলছেন ? তখন কিছুটা নরম হয়ে বললেন, হ্যাঁ আপনি বেঁচে আছেন সেটা না হয় মেনে নিলাম কিন্তু আপনি যে গত তিন মাস বেঁচে ছিলেন তার প্রমাণ কোথায়—তখন তো আমি আপনাকে দেখিনি। যদি বেঁচে থেকে থাকেন তবে আমার জানা দরকার তখন আপনি আর কোথাও কাজ করেন নি। দেখুন কোথাকার জল কোথায় গড়াল, সরকার একজনকে ভার দিয়েছে পেনসন বিলি করার জন্য যাতে ঠিক সময়েই সবাই পেনশন পায়—অবশ্য এটাও দেখতে বলেছেন কেউ যেন ফাঁকি দিয়ে যিনি গত হয়ে গেছেন তার নামে টাকা ঠকিয়ে না নেয়—সরকারি নিয়ম মত যেন সব দেওয়া হয়। তার কি মানে করা হয়েছে দেখুন—আসল কাজটা ভুলে গিয়ে লোককে হ্যারাস করা। এত ডিটেল করে কোন নিয়মকানুন তৈরি হয় না, নিজের বিবেচনা মত কাজ করবে যাতে মূল উদ্দেশ্য না ব্যর্থ হয়।—আশা করি বুঝছেন, এটা গল্পই ; সত্যি নয়।

অর্গানিজেশন কত বড় হবে—তার উত্তর পেতে হলে, কেন এটাকে করা হয়েছে সেটা যাচাই করা দরকার। গোড়াতেই বলা হয়েছে কাজের সুবিধের জন্য যাতে সুষ্ঠু ভাবে সব কিছু কাজ হয়—দোকানে খদ্দের যাতে সস্তায় ভাল জিনিস পায় অযথা দাঁড়িয়ে না থাকতে হয়—সোজা কথায় বলতে গেলে যাতে বেশী ভাল চলে, তার জন্য যতটা বড় হওয়া দরকার ততটা বড় হবে—যদি তার থেকে বড় করা হয় শুধু শুধু খরচা বেশি পড়বে। মাছের বাজারে যান একজনই খদ্দেরের সঙ্গে দরদস্তুর করছে, মাছ ওজন করছে, পয়সা হিসেব করে নিচ্ছে, কেটে দিচ্ছে ; বলতে গেলে একাই সব করছে—অথচ সরকারি মাছ বিক্রি করবার সময় দেখলাম—প্রথমে একজন কি মাছ নেবেন সেটা হিসেব করে স্লিপ কেটে দিল—তারপরে সেই টাকা জমা নিয়ে আর একজন রসিদ দিল—সেই রসিদ দেখিয়ে তবে অন্য একজনার কাছ থেকে মাছ নিতে হোল। একজনই মাছ কেটে দিচ্ছে। খুব যে বেশি বিক্রি হচ্ছে তা নয়—একজনই খেটে মরছে বাদবাকি দুজন আরাম করে বসে তদারকি করছে আর হুকুম করছে—যে মাছ কাটছে তার করুণ অবস্থা। এইরকম প্রথা কার স্বার্থে তৈরি করা হল, খদ্দেরের কি লাভ হচ্ছে—স্রেফ দাম বাড়াবার ফিকির, না হয় কিছু লোককে কিছু পাইয়ে দেওয়া। এটাকে কোন্ দিক দিয়ে আপনি সমর্থন করবেন ? একজনের উপর দুজনের খবরদারি—একজনকে

খাটিয়ে দুজন বসে বসে খাবে—এটা কেউ করবার কথা ভাবেই না। কোথাও স্বনির্ভরশীল দোকানে এটা হয়েছে বলে শুনিনি। হ্যাঁ আপনার যদি দশটা সেল্‌স্‌ কাউন্টার থাকে তবুও না হয় এর মানে বুঝি—তাতেও দেখতে হবে পড়তায় পোষাচ্ছে কি না—অনেক বড় বড় দোকানই এটা চালু করতে গিয়ে লাটে উঠেছে।

মনে রাখবেন অর্গানিজেশন যত বড় হবে, তত ইনএফিসিয়েন্ট হবে, খরচও বেশি হবে, সেটা টেকনিক্যাল সুবিধে দিয়ে পুষিয়ে নিতে হবে, তা না থাকলে লোকসানের ভাগ বাড়বে। ৭ জন লোকের দেখাশুনা একজনে ভালভাবেই করতে পারে—সুপারভাইজার ১ : ৭। যদি সত্তর জনের কারখানা হয় তখন সত্তর জনের জন্য দশজন সুপারভাইজার—আবার দশজন সুপারভাইজারের কাজ দেখবার জন্য তিনজন ফোরমেন—তার ওপরে একজন ম্যানেজার আর তার অফিস স্টাফ—মোট ধরতে পারেন ১০-৩-১-৩ প্রায় সতেরজন। ১৭ : ৭০। চারজন শ্রমিকের ঘাড়ে একজন করে ষ্টাফ, তাও আবার বেশি মাইনের। আরো বড় হলে দুজনের ঘাড়ে একজন। আর স্টাফের মাইনে অনেক বেশি। একেই বলা হয় টপ হেভি অর্গানিজেশন। সেনট্রালাইজড বড় অর্গানিজেশন-এ এটা হতে বাধ্য—তাই কি কি ভাবে এর সুবিধেটুকু নিয়ে অসুবিধে দূর করা যায় তারই প্রচেষ্টা। বড় বড় শিল্পপতিরা তাদের নানা কোম্পানিকে আলাদা করে দিয়েছে। ডাইরেকটারের ওপর ভার—স্বাভাবিক নিয়ম বজায় রেখে তুমি যেমন খুশি চালাও—তোমার কাজ বিচার হবে কতটা লাভ হয়েছে তাই দিয়ে—আমরা তার মধ্যে নাক গলাতে যাব না—যদি না খবর পাই তুমি এমন একটা কিছু করছ যাতে কোম্পানি ডুবে যেতে বসেছে,—তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোকের চাকরি। তোমরা সবাই মিলে যদি যুক্তি করে ডুবতে চাও ডোব, আমি নাচার।

অ্যাকাউন্টেবিলিটি—সার্থকতা

সব কাজের কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে—অবজেকটিভ, সেই কাজের ভার বা দায়িত্ব কারো উপর দেওয়া হয়—রেস্‌পন্‌সিবিলিটি, আর সঙ্গে সঙ্গে কাজ করার জন্য যা যা দরকার তাও দিয়ে দেওয়া হয়—অথরিটি। উদ্দেশ্য যদি ঠিকমত সিদ্ধ হয়, তখন বোঝা যাবে, যাকে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে সে কাজের যোগ্য, এফিসিয়েন্ট। কতটা খরচ-খরচা করে কাজটা করা হল তার হিসেব দেওয়াকে বলা হয়—অ্যাকাউন্টিং। আর সেই হিসেব বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্বকে বলা হয়—অ্যাকাউন্টেবিলিটি।

অবজেকটিভ, রেস্‌পন্‌সিবিলিটি, এফিসিয়েন্‌সি, অথরিটি, অ্যাকাউন্ট বা উদ্দেশ্য-দায়িত্ব-দক্ষতা-ক্ষমতা-হিসাবদক্ষতা—এইসব বিষয়ে দু'একটা কথা প্রথমে একটু আলোচনা করে নিই।

রেস্‌পন্‌সিবিলিটি—কাজের দায়িত্ব কোন একজনের ওপরেই দিতে হবে—সেখানে কোন ভাগ চলবে না। তা না হলে, আপনি কাজ না হলে কাকে দায়ী করবেন, দুজনে যদি করে কাকে কতটা বকবেন, আর কি হিসেবে দায়ী করবেন ? এই যে আপনি করছেন তার মানে হচ্ছে আপনি কাজটা শেষ হবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন—দুজনের মধ্যে কাজটা ভাগ করে দিয়েছিলেন, তারই বশে কে কতটা করেছে তাই যাচাই করছেন। দুজনেই সমান দায়ী বললে, কাজ না হলে একে অপরকে দোষ দেবে, কাউকেই ঠিক ধরা যাবে না, কাজটা হলে দুজনেই ভাববে, আমার জন্য হয়েছে, ক্রেডিট বা সম্মান আমারই প্রাপ্য, অপরে সেখানে ভাগ বসাচ্ছে, আর তার থেকেই আসবে রেষারেষি। আবার এর অন্য একটা দিক আছে—কোন লোকই একজনের বেশি লোকের কাছে দায় বুঝিয়ে দিতে পারে না, আপনি যদি দুজনকেই সমান দায়িত্ব দেন—তারা যদি নিজেদের মধ্যে আপোসে তা ভাগ করে না নেয়—দুজনেই যদি তাদের নিচের লোকদের নিজের মনের মত হুকুম দিতে থাকে তবে লোকজনেরা কার কথা শুনবে ? মাঝখান থেকে তারা ফাঁকি দিতে পারে, বলবে "কি করব বলুন, আমি তো আপনার কথা মতই কাজ করতে গিয়েছিলাম, উনি এসে বললেন না করতে হবে না—ওভাবে করলে চলবে না, কার কথা শুনব বলুন ? আমরা তো

দোটানায় পড়েছি।" তাই দুজন থাকলে নিজে যদি তার মধ্যে নাক গলাতে না চান—যা উচিত নয়—তবে তাদের একজনকেই মুখ্যভাবে দায়ী করতে হবে, আর বলতে হবে, অপরকে কোন্ কাজের ভার দেবে তা তুমি ঠিক করবে। মনে রাখবেন অত কথা কেউ বলে না, ব্যক্ত করা হয় খুবই কম, অনেকখানি থাকে সুপ্ত বা ইমপ্লায়েড, না বললেও সাধারণ ভাবে তা বুঝে নেয়। যাকে কোন কাজের ভার আপনি দিয়েছেন, সে কিরকম কাজ করল তা যাচাই করার পুরো অধিকার আপনার আছে, যাকে যাচাই করার অধিকার আপনার নেই তার কাজের দায়িত্ব আপনি নেবেন কেন? যাচাই করা মানে এই নয় আপনি তার ঘাড়ের ওপর বসে থাকবেন, প্রতিটি কাজের খুঁটিনাটি দেখবেন,…কিছুটা কাজের স্বাধীনতা নিশ্চয় দেবেন, তা যদি না দিতে পারেন তবে বুঝব যাকে ভার দিয়েছেন সে কোন কাজের নয় অথবা আপনি ঠিক তাকে বিশ্বাস করতে পারেন না, কিংবা আপনার ধাতই ঐরকমের যে আপনি কারো ওপর ভরসা করতে পারেন না, সব নিজের হাতে করা চাই। তাতে করে সব কাজ শেষমেষ আপনার ঘাড়েই এসে পড়বে, কোন কাজ এগোবে না। আপনি একা আর দশজনের কাজ করতে পারেন না, পারলে ঐ দশজনকে রাখার কোন যুক্তিই ছিল না, শুধু আপনাকে রাখলেই হত। এমনও হতে পারে আপনার দায়িত্ব সম্বন্ধে অহেতুক একটা ভুল ধারণা আছে —তার যে কোন সীমা আছে সেটা ঠিক বোঝেন না। আপনি কাউকে কাজের ভার দিলে সে নিশ্চয় একটু আধটু ভুল করতে পারে, সেটাই মানতে আপনি রাজি নন। আপনি চান ছেলে আছাড় না খেয়েই হাঁটতে শিখবে, জল না খেয়েই সাঁতার কাটতে শিখবে। কাজ লোককে শিখিয়ে নিতে হয়, শিখে কেউ জন্মায় না—রেডিমেড লোক পাওয়া যাবে কোথায়? আস্তে আস্তে শিখিয়ে নেবার কাজটা আপনার। ভাল ভাল প্লেয়ার নিয়ে কোচকে অনেকদিন ধরে খেলাতে হয়, যাতে একে অন্যের মুভমেণ্ট বা খেলার ধরন বুঝতে পারে, কাউকেই কিছু বলতে হয় না, একেই আমরা বলি আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং। এটা হলেই তবে টিম ওয়ার্ক হবে—অন্যের অবরোধ ভেঙ্গে গোল দিতে পারবে। তা বলে যত বড় কোচই হোক না কেন, কোন আনকোরা কাউকে দুদিনে ক্লাস প্লেয়ার বানাতে পারবে না, আর তার কাছ থেকে সেটা কেউই আশাও করে না। দায়িত্ব আবার প্রত্যক্ষ—যার জন্য আপনি

সোজাসুজি নিজে দায়ী, এবং পরোক্ষ, যেটা—ঠিক ভাবে হচ্ছে কি না বুঝে নেওয়ার দায়িত্ব—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। আপনি যাদের কাজ বুঝে নেবেন তাদেরও তো অন্য কারো কাজ বুঝে নেবার দায়িত্ব থাকতে পারে। এইরকম ভাবে আপনার দায়িত্ব তো অনেক লোকের—কিন্তু প্রত্যক্ষ দায়িত্বের ওপরেই জোর বেশি দেওয়া হয়।

অথরিটি বা ক্ষমতা—দায়িত্ব যদি পালন করতে হয়, তবে তার দরকার মত ক্ষমতাও আপনার থাকা দরকার। ক্ষমতা, যার যত বেশি, দায়িত্বও তার তত বেশি। দায়িত্বহীন ক্ষমতা সবার থেকে খারাপ জিনিস, লোককে অটোক্র্যাট করে তোলে। ক্ষমতা বলতে আমি টাকা পয়সা, হুকুম দেবার আর তা পালন করা হয়েছে সেটা দেখে নেবার ক্ষমতা এসবের কথাই মনে করি। কিন্তু এটা মনে রাখা দরকার, যে ক্ষমতা আমার নেই তা তো আমি কাউকে দিতে পারি না। দেশের নিয়মে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেটা নিয়েই কাজ করতে হবে। এটাও মনে রাখা দরকার সব সময়, যখন তখন ক্ষমতা দেখালে কাজ যে খুব এগোয় তা নয় বরং অন্য সবাকার 'সহযোগী বা সহকর্মী' এই মনোভাব আনতে পারে না, দূরে সরিয়ে দেয়।

যখন কয়েক জন লোক একসঙ্গে কাজ করে তখন তাদের মধ্যে কো-অরডিনেশন থাকা চাই—এটার দায়িত্ব বেশির ভাগ কর্তার—সবাই যেন একই উদ্দেশ্যে কাজ করে, দশ জন যদি দশদিকে টানতে থাকে কাজ এগোবে না, সকলকেই এক সঙ্গে একই সময়ে টানতে হবে। এটাতো সবাই জানে, তা কি কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয়?—হয়, কেন না সব কাজই তো দড়ি টানাটানি নয়, যে চোখের সামনে সব দেখা যাবে, আবার কাজ করার ধরন সকলের এক নয়, ধারণা সকলের আলাদা। প্রত্যেকটা প্লেয়ারকে কোচ কয়েকদিন ধরে খেলিয়ে বুঝিয়ে যে আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং আনিয়ে টিম ওয়ার্ক করায়, তাই হচ্ছে কোঅরডিনেশন। কোন লোকের যদি এটার অভাব হয় তাকে আমরা বলি ল্যালাখ্যাপা। ছোট খাটো কাজে এটা করা যত সোজা মনে হয়, বড় কাজে অতটা সোজা নয়,—দেশের ভালো আমরা সকলেই চাই, কিন্তু কিসে ভালো হবে তার ধারণা সকলের আলাদা, যত মত তত পথ, তাদের সকলকে একমতে আনা একই ভাবে কাজ করানো যে কতটা শক্ত তা আমাদের বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থার কাজ দেখলেই বুঝতে পারবেন।

উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ হয় তবে অন্তত এটা বুঝব খাটাখাটনি সার্থক হয়েছে, কিন্তু সেটা কতটা সার্থক হয়েছে—কতটা খরচপাতি করে কাজ উদ্ধার হয়েছে—তাই দিয়ে বিচার হয় লোকটা কত কাজের, অর্গ্যানিজেশন কতটা ভাল, এটা পড়ে অ্যাকাউণ্টেবিলিটির মধ্যে। কাউকে কোন জিনিস কিনতে দিলে সেটা আনা হলে বলি, কাজটা বা কেনাটা হয়েছে, তখন যদি জানতে পারেন যে জিনিসটা বাজারে দশটাকায় পাওয়া যায় সেটা বিশ টাকায় কেনা হয়েছে—তখনই মনে হবে লোকটা আপনাকে ঠকিয়েছে—অথবা নেহাৎ বোকা, তাকে বাজারে পাঠান চলবে না—এটাতো ও পয়সার হিসাব না দিলে আপনি বুঝতে পারতেন না। এ নিয়মটা সবার বেলায়—সব কাজের বেলায় সমান ভাবে প্রযোজ্য—ব্যবসাই করুন বা দান করুন। তাই হিসেব করা খুবই দরকার—আর যে কাজ করছে তারও জানা দরকার তাকে কি ভাবে যাচাই করা হবে, যাতে সে বুঝে সুঝে ভালো ভাবে কাজ করতে পারে। ব্যবসার বেলায় ধরে নিই লাভ করা মুখ্য উদ্দেশ্য—লাভ হলে বুঝলাম ব্যবসা সার্থক—যত বেশি লাভ হবে তত ভাল ব্যবসা চলছে। কিন্তু দানের বেলায়? কাউকে বললেন যাও দশটা টাকা দান করে এস, সে যদি সেই টাকাটা পকেটে পুরে বলে, দান করেছি—তাতে দানটা ঠিকই হয়েছে, আপনার টাকাটাও খরচ হয়েছে—সেটুকু পুণ্য অর্জনও হয়েছে। কিন্তু এটা বললে তো আর আপনি খুশি হবেন না, টাকাটা আপনার পকেটে নিশ্চয় কামড়াচ্ছিল না যে ফেলে দিতে বলেছেন—তাই যদি হত, কাউকে বলার দরকার কি, ফেলে দিলেই হত। কি ভাবে দান করল, কাকে কাকে দান করল সেটা নিশ্চয় জানতে চাইবেন।

উদ্দেশ্য সবটা অত পষ্টাপষ্টি করে অত ডিটেলে কেউ বলে না—অনেকখানি অব্যক্ত থাকে, তা বলে সেটা কারো না বুঝবার কথা নয়। তবে কেউ-কেউ বোকা সেজে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বা অকর্মণ্যতা ঢাকবার জন্য না-জানার ভান করে। সে যে যাই করুক না কেন, ওপরে যিনি থাকবেন তাঁকে তা যাচাই করতে হবে এবং যাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সেই অনুপাতে কড়া হতে হবে। কড়া যদি না হতে পারেন তবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যাবার চেষ্টা করবেন না। আমি দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি—হাসপাতাল হয়েছে রোগ সারাবার জন্য, রোগীকে বা দুঃস্থকে খাওয়াবার জন্য নয়, অথচ

কাগজে দেখি যাদের হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ করা হয়েছে তারা যাবার নামটিও করছে না, বেশ জাঁকিয়ে বসে আছে। অথচ যাদের সত্যিই বেশি দরকার তাদের চিকিৎসা হচ্ছে না তখন কি করবেন? আবার দেশবিভাগের পর অনেক ছিন্নমূলকে যে সুষ্ঠুভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য অনেক সাহায্য করা হয়, তাদের ভিখারী বানাবার জন্য নয়। যারা ৩০ বছরেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলো না, বুঝতে হবে কোথাও কিছু গোলমাল আছে, হয়তো তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় না, অথবা ভাবে, আপনাদের দয়ায় কিছু না করে কাঁদুনি গেয়ে বেশ তো চলে যাচ্ছে, তবে আর কষ্ট করা কেন? তেমনি সিক ইণ্ডাষ্ট্রি; সরকার ভার নিয়েছেন যাতে করে টাকা আর সুবন্দোবস্ত করে তাদের নিজের পায়ে দাঁড় করানো যায়, বসিয়ে বসিয়ে, ইণ্ডাষ্ট্রি ইণ্ডাষ্ট্রি খেলা করে অকর্মা পোষার জন্য নয়। যদি তারা দাঁড়াবার চেষ্টা না করে তবে কি করবেন? তাদের নাম করে দেশের অন্য সবাইয়ের কথা ভুলে উন্নতি চুলোর দিয়ে খাইয়ে যাবেন? আপনি বলতে পারেন দয়া। আর কেউ বলবে নিশ্চয় ভাগ বাঁটোয়ারা হচ্ছে, ক্যাডার পুষছে। অথবা বলবে একেবারে অকর্মণ্য সরকার, মুখেই যত বাড়ফট্টাই কাজের বেলায় ঢুঁ ঢুঁ, তাদের কথায় কে কান দেবে, কে গ্যাস খেয়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে, তার থেকে যা হচ্ছে হোক আমি নিজেরটা গুছিয়ে নিই। অতটা না হলেও মুখ বুজে থাকি। তেমনি ধরুন, ইউনিয়ন, যা খেটে-খাওয়া লোকের প্রতিষ্ঠান হয়েছে মালিকের অত্যাচারের হাত থেকে, খামখেয়ালির হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে, ন্যায্য দাবিদাওয়া আদায় করতে। সেটাকে কি ভাবে অপব্যবহার করা হয় যা কোন লিডার মনেও আনেনি। যেই বললেন তোমার চাকরি পারমানেণ্ট অর্থাৎ অন্যায় ভাবে তোমার চাকরি যাবে না, সঙ্গে সঙ্গে সবাই বিছানা পত্তর নিয়ে হাজির, কাজ চুলোয় যাক, কাজ করি না করি কেউ তো আমার কিছু করতে পারবে না, চাকরি পাকা। এটার জন্য আমাদের এত কষ্ট করে এত স্বার্থ ত্যাগ করে অ্যাসোসিয়েশন আর ইউনিয়ন গড়া হয়নি, অথচ দেখুন ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তাদেরই মুখপাত্র হতে হচ্ছে, তাদের মধ্যে যাদের কিছুটা চক্ষুলজ্জা আছে তারা পেছিয়ে পড়ছে, অযৌক্তিক নগ্ন স্বার্থ আর রক্ত চক্ষুই আসর জাঁকিয়ে বসছে। এর থেকেই এসেছে আমার আগের গল্পটা, আপনি যে বেঁচে ছিলেন তার প্রমাণ কোথায়?

কাজের ধরন

সার্থক ভাবে কাজ করতে হলে কি কি দরকার? সেটা তো এক কথায় বলা বলা যাবে না। কারণ কাজ অনেক রকমের হয়, নানারকম কাজের জন্য উপকরণাদিও চাই নানা রকমের, কোথাও কাজ হচ্ছে একজনে, কোথাও কাজ হচ্ছে দশ বিশ হাজার মিলে, সরকারি ক্ষেত্রে কয়েক লক্ষ লোক মিলে। তাই কোন একটা নিয়ম সকলের পক্ষে সমান ভাবে খাটবে না। তবুও যাতে একটা সহজ ধারণা করতে পারা যায় তার জন্য সরল করে নিয়ে কথাগুলি বলছি।

প্রথমে যে কাজ শুরু হয় সেটা খাবার খুঁজে বের করে হাতে হাতে পাওয়া। বাঁচতে হলে সব প্রাণীকেই খেতে হয়, তাই খাবারের খোঁজে সকলই ব্যস্ত। একসময় অন্যান্য প্রাণীদের মত মানুষ ছোট ছোট শিকার ধরে খেত, নদী বন থেকে মাছ, খরগোস, হরিণ, বরাহ ইত্যাদি শিকার করত। তার জন্য কত রকমের অস্ত্র, কত জোগাড়যন্ত্র। মারতে পারলে বড় কিছু খেতে মানুষের আপত্তি নেই, তবে একা মারা অতটা সহজ নয়, বলে অনেকে মিলে অনেক শলাপরামর্শ করে চারদিক থেকে ঘিরে পাথর তীর বল্লম দিয়ে বড় প্রাণীকে কাবু করতে হত। পাখিও অন্য প্রাণীদের দেখে গাছের ফল শিকড়, খেতে শিখল। এটাকে আমরা আহরণের যুগ বলি, যখন খাদ্য নিজে থেকেই হচ্ছে শুধু কষ্ট করে জোগাড় করতে হবে। তারপরে এলো চাষবাস, পশুপালন। মানুষ আর প্রকৃতির দেওয়া খাদ্যের ওপর নির্ভর না করে উৎপাদন করতে শিখল, তা চাষ করেই হোক্, গাছ লাগিয়ে যত্ন করেই হোক বা জীবজন্তু পুষেই হোক। আমাদের দেশের শতকরা সত্তর ভাগ লোক আজও এর ওপরেই নির্ভরশীল। এর পরে এলো কুটির শিল্প—তাঁতি কামার কুমোর এদের কাজ। এখন এসেছে অনেক বড় বড় শিল্প—তার শক্তি জোটাচ্ছে পাওয়ার স্টেশন। আর আমরা যে সংগঠন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি সেগুলি হল এই বড় বড় শিল্প আর সরকারি সংস্থা।

আহরণের জন্য কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, পেটের জ্বালায় সকলে মিলে কাজ করছে। তবে যখন থেকে চাষবাস শুরু হয়েছে তখন লোকে জমাতেও শিখেছে। একসময়ে ফসল তুলে সারা বছর ধরে খেতে শিখেছে,

বুঝতে পেরেছে; খাটলেই শিকারের মত হাতে হাতে ফল পাওয়া যায় না, অনেক দিন বা অনেক বছর অপেক্ষা করতে হয়। সব সময় খাবার পাওয়া যায় না, তাই আজকে কম খেয়ে বা বেশি খেটে আগামী দিনের জন্য সঞ্চয় করতে হয়। সবাই তো এটা নাও বুঝতে পারে, অতটা ধৈর্য নাও থাকতে পারে, কিন্তু না থাকলে তো চলবে না, ওদের দলের সর্দার সেটা করিয়ে ছাড়বে। সকলকে কাজ বুঝিয়ে দেবে, কাজ হাসিল হয়েছে কিনা দেখবে, কাজ না করলে শাস্তি দিতে বা তাড়িয়ে দিতে মোটেই দ্বিধা করবে না। পাঁচ-দশ বছর বাদে যে গাছ ফল দেবে তাকেও যত্ন করতে বাধ্য করাবে, তিন-চার বছর ধরে গরু পুষে মাঠে চরিয়ে দুধের যোগাড় করাবে। প্রাপ্যটা মোটেই হাতে হাতে নয়, গাছের ফল পেড়ে খাওয়া সেটাতো ফল পাড়ার খাটনির জন্য নয়, তার সঙ্গে অনেক দিনের খাটনি জড়িয়ে আছে। আহরণ ছাড়াও অনেকখানি অবদান এতে আছে, তাই আগের খাটনি না খেটে শুধু ফলটি পেড়ে খাব বা খাওয়া স্রেফ চুরি, অন্যের খাটনি চুরি। তবে যে কারো চুরি করতে আপত্তি ছিল তা নয় ধরা না পড়লে ঠিক আছে, ধরা পড়লে শাস্তিও নিতে হবে। প্রায় জান যাবার যোগাড়। তবে সবাই মিলে করলে সেটা আর চুরি বলা হত না। বিজয়ীর প্রাপ্য সম্মান বলে ধরত, এবং তাই নিয়ে মারামারি কাটাকাটি লেগেই থাকত। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে, এই অবস্থায় কে আগে খেটে চুরি করার জন্য সম্পদ তৈরি করবে। তাই যেটুকু না করলে নিজে বাঁচতে পারবে না সেটুকু ছাড়া কিছু করতে রাজি নয় বরং তারা সবাই দল বেঁধে লুট করতে তৈরি। সবাই লুটেরা, কে কাকে লুট করবে বা কি-ই বা লুট করবে, এটা অরাজকতা। আর তার হাত থেকে বাঁচতে, দেশে সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে, শান্তিতে চাষবাস ব্যবসা-বাণিজ্য করতে তারা নিজেরাই রাজা খাড়া করছে, তার হুকুম মানতে রাজি হচ্ছে—দুর্বল রাজাকে সরিয়ে অপর কেউ বসলে তাকেই মানতে রাজি, মোদ্দা কথা রাজা চাই তাকে খাওয়াতে-পরাতে তার খরচা-খরচ দিতে, তার একটু আধটু অত্যাচার সহ্য করতেও রাজি। আমরা অবশ্য সেসব দিন পেছনে ফেলে এসেছি। এখন কেউই চুরি-ডাকাতি সহ্য করবে না, পরের দেশে আক্রমণ করতে গেলেও নানচের আড়ালে করতে হয়। রাজা ছাড়াও রাজত্ব চলে। তার বদলে দেখা দিয়েছে নানা রকমের আইন ও টাকার হিসেব য

আগে অতটা করতে হত না। সেগুলো সম্বন্ধে ধারণা না থাকলে ভালভাবে কিছু পরিচালনা সম্ভব নয়। আগের দিনে নিজের সম্পত্তি বলে খুব কিছু থাকত না, সবই প্রায় গোষ্ঠির, তাই কে গাছ লাগালো, কে চাষ করল নিজেদের মধ্যে তার হিসেব করতে হত না। এখন নিজস্ব সম্পত্তি—তার মধ্যে আবার টাকা-পয়সার হিসেব, কাজের জন্য কতটা প্রাপ্য আর সম্পত্তির জন্য কতটা প্রাপ্য তার চুলচেরা বিচার করতে হয়। তাও আপনার বিচার সকলে মানলে তো? আবার সকলের কাজ সমান নয়, সেখানে কোন্ কাজের কত দাম তাও ঠিক করে দিতে হবে।

কার্ল মার্কস বলেছেন কোন জিনিসের দাম নির্ধারিত হয় তাতে যত খাটনি পড়েছে তার সমষ্টি দিয়ে। তা তো বুঝলাম, কিন্তু খাটনির দাম কত হবে? "যে জিনিস তৈরি হয়েছে তার দামের সমান"। এর মানে হচ্ছে শুধু খাটলেই হবে না, ফলপ্রসূভাবে খাটতে হবে, "আসব যাব মাইনে পাব" সেটা মানতে রাজি নয়। আবার টেক্‌নোলজির সাহায্যে অনেক কম খেটে কেউ যদি অনেক বেশি ফলপ্রসূ কাজ করে তবে তার জন্য টেকনিকের খাতে কত দেবেন, আর যে খাটছে তাকেই বা কত দেবেন? মাথায় করে মাল এখান থেকে ওখানে নিয়ে গেলে মজুরকে যে টাকা দেবেন নৌকায় করে সে মাল নিয়ে গেলেও কি সেই হিসেবে দেবেন? আবার সে টাকাটা কি হিসেবে ভাগ হবে, নৌকার মাঝিমাল্লারা কত পাবে, যে হাল ধরছে তাকে কত দেবেন, যার নৌকা তাকে কত দেবেন, আর যে খদ্দেরের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিয়েছে তাকে কত দেবেন? অন্য কিছুর দাম কেন দিতে হবে বলা সোজা, কিন্তু অনেক জিনিস তো হাওয়া বাতাসের মত বিনি পয়সায় পাওয়া যায় না। মাটির তলায় তেল আছে, সরকার এক আইনে তার দখল নিতে পারেন, কিন্তু আরব দেশ যদি শুধু তোলার খরচে তেল না দেয় তবে কি করবেন? দেখতেই পাচ্ছেন আরব দেশ সকলের গলা টিপে ধরে কেমন ঝাঁকানি দিচ্ছে। অথচ ওদের জিনিস ওরা কি দামে বিক্রি করবে সেটা ওদের ওপরেই নির্ভর করে, খাটনির দামের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। তেমনি, দাঁও বুঝে বাজারে কেউ বেশি দামেও জিনিস কেনা-বেচা করে। আবার সেই টাকায় ব্যবসা করে অনেক সম্পত্তি করতে পারে। ব্যবসা করা অন্যায় কেউ তো বলেনি। সেটাকে কি চুরির পর্যায়ে ফেলবেন?

সরকারও তেমনি জনগণের স্বার্থে আপনার সব সম্পত্তি নিয়ে কম্‌পেন্‌সেশনের নামে বিল্বপত্র ধরিয়ে দিতে পারে। সবই তো হতে পারে বোঝা গেল, কিন্তু যে মনে করে তাকে খাটিয়ে ঠিক পাওনা দেওয়া হয় নি, যে মনে করে তার গুণের ঠিক মত কদর হচ্ছে না, যে মনে করে তাকে অন্যায়ভাবে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তার টাকার প্রাপ্য সুদ পাচ্ছে না, তার পরিচালনা, ক্ষমতার সঠিক মূল্যায়ন হচ্ছে না—তাদের রাগ, অসন্তোষ কি ভাবে চাপা দেবেন —মুখে কিছু না বলতে পারে, ভাবে, ভঙ্গিতে—ভয়ে কিছু প্রকাশ নাও করতে পারে কিন্তু মনের ভেতর তো বিষিয়ে থাকবে। বললেন, চুলোয় যাক, তাতে কি আসে যায়?—না তাতে অনেক কিছুই আসে যায়, আজ-কালকার শিল্প ঠিক গতর খাটিয়ে হয় না, অনেক বুদ্ধি-বিবেচনা অনেক ঝুঁকি অনেক বিশেষ জ্ঞান নিয়ে করতে হয়। সকলের ওপর সকলের নির্ভর, লেঠেল দিয়ে তাদের কাজ করান যায় না। আর এটাও ভুলবেন না, যাদের কথা বলছি তারা তো সকলের মাথার ওপরের দিকে আছে বলেই তারা নয়, যারা প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী, তাদের হাতে অনেকখানি ডিসক্রিশনারি পাওয়ার, তাদের ওপর লাখ লাখ, কোটি কোটি টাকার ভার, তারা সমবেত ভাবে রাজ্যের শাসন, শিক্ষা, বিচার, শিল্প, ইত্যাদি সব কিছু বিভাগ দখল করে আছে, তাদের কি করে ঠেকাবেন, তারা কেন অন্যায় অবিচার সহ্য করবে? ন্যায় বিচার সঙ্গত আইন, আর তার প্রতিষ্ঠা করা, আজকের দিনে খুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

সভ্যতার প্রথমে হাতিয়ারের দরকার কম ছিল। যে যার হাতিয়ার নিয়ে ঘুরছে, যা কিছু করছে নিজের স্বার্থে, শিল্প যখন বড় হোল তখন অনেক যন্ত্রপাতির দরকার—তাই ধনী ছাড়া কেউই তা করতে পারত না বা মালিক হত না। এর পর এল যৌথ প্রচেষ্টা যাতে আরো একটু বেশি টাকা দিয়ে বড় বড় ব্যবসা বা শিল্প করা যায়। তখন ঠিক নিজের স্বার্থ না বলে নিজেদের স্বার্থ কথাটা বেশি চালু হল, তবে এরা নিজেরাই শিল্পের বড় বড় পদ-গুলি দখল করে থাকতেন, নিজেদের মধ্যে ঠিক করতেন, কোন্‌টা করা ভাল। এরপরে দেখা গেল শিল্প করতে গেলে আরো অনেক বেশি টাকার দরকার —তখন শুরু হল লিমিটেড কোম্পানি খাড়া করা। জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ, যারা টাকা দিচ্ছে অথচ কি ভাবে কাজ

চলছে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না, বছর গেলে লভ্যাংশ পেলেই খুশি। এরাই হল আমরা যাদের বলি ক্যাপিট্যালিস্ট (পুঁজিবাদী), যদি অবশ্য ওর আয়ের বড় অংশ এর থেকে আসে। ওদের দেওয়া টাকাকে বলা হয় ক্যাপিট্যাল বা মূলধন। বড় বড় শিল্পের একটা মোটা অংশই আসতে লাগল এভাবে, যারা পরিচালক তাদের ভাগ কমে আসছে। পরিচালনার জন্ত বাইরে থেকে এক্সপার্ট নেওয়া হচ্ছে তাদের শেয়ার থাকুক আর নাই থাকুক, এরাই হল প্রফেশন্যাল ম্যানেজমেন্ট, নিজেদের প্রতিভা আর কর্মক্ষমতার জোরে বড় বড় শিল্প চালাবার ভার পেয়েছে। শেয়ার-হোল্ডারের তদারকি কমে আসছে। ধনীরা শুধু শেয়ার থেকে টাকা পাচ্ছে তা নয়—নিজেরা ব্যাঙ্ক খাড়া করে তার টাকাও ব্যবসায়ে খাটাচ্ছে, ইনসিওরেন্স কোম্পানি খুলে তার টাকাও ঢালছে, অথচ যাদের টাকা, পরিচালনায় তাদের কোন হাতই নেই। তাদের হয়ে কথা বলারও কেউ নেই। আবার পরিচালকরা তাদের সামাজিক কোন দায়িত্ব আছে বলে মনে করে না, নিজেদের সুবিধের জন্য সব কিছু করতে রাজি। লাভের সব গুড় নিজেরাই খাচ্ছে, আর কিছু খারাপ হলে ডুবছে সাধারণ লোক, কত ব্যাঙ্ক আর কোম্পানি এরজন্য লাটে উঠেছে তার ইয়ত্তা নেই। অতখানি ক্ষমতা; অথচ দায়িত্ব বলে কিছুই নেই। আবার এরই মধ্যে যারা কাজ বোঝে আর দায়িত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল তারা ফুলে ফেঁপে উঠছে, সবাই তাদের শেয়ার কিনতে চায়, ব্যাঙ্ক তাদেরই টাকা দেয়। এরাই তো কাজের লোক—প্রোমোটার, এনটারপ্রেনিয়োর' এদের সংখ্যা এত কম আর ঠগ এত বেশি, তাদের হাতে টাকা পয়সার এত সহজ উপায়গুলি আর ছেড়ে দেওয়া যায় না, তাই সরকার ব্যাঙ্ক আর ইনসিওরেন্স কোম্পানি দখল বা নিজেদের কন্ট্রোলে আনতে বাধ্য হয়েছে। এতে, যারা ভাল ব্যবসা করে তাদের টাকা পেতে অসুবিধে নেই তবে মুঠো করে টাকা তুলে নিলাম—তা আর হচ্ছে না। দায়িত্ব নিয়ে সব কিছু বুঝিয়ে টাকা নিতে হচ্ছে। দায়িত্বহীন ক্ষমতা নেই। এই ভাবে বড় বড় শিল্পগুলিও সরকারে হাতে এসে পড়েছে, সরকার নানাভাবে অনেক শেয়ারের মালিক হয়ে বসেছে। কোথাও সোজাসুজি ন্যাশনালাইজ করেছে কোথাও ইনসিওরেন্স আর ইউনিট ট্রাষ্টের মাধ্যমে, যদিও কোম্পানির নাম পাল্টায়নি মালিক পাল্টে গেছে, তবুও যে অনেক জায়গায় মালিকরা আছে তা ওদের

কর্মক্ষমতার জন্য, ওরাও প্রফেশন্যালভাবে ম্যানেজ করছে, মালিকহিসেবে নয়। সব কিছুর জন্য জবাব দিহি করছে।

এই অবস্থায় আগের নিয়ম আর খাটছে না, মালিক নিজের স্বার্থে ঠিক ভাবে সব চালাবে তা আর বলা যায় না। আজকের যে কোন বড় শিল্পের কথাই ধরা যাক—ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, রেলওয়ে, ষ্টীলপ্ল্যান্ট, ইলেকট্রিসিটি বোর্ড বা সরকারি পরিবহণ সংস্থাই ধরুন, এদের সামাল দেবে কে? ধরা যাক এদের কেউ বা, কোন অংশ একটা দাবিপত্র নিয়ে হাজির, তার ফয়সালা করবে কে? যারা দাবি করছে তারা তো দলে ভারী, ভোট নিয়ে যে করবেন তা কি ঠিক হবে? প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার জন্য না হয় ম্যানাজমেন্ট বসল, তারা কি করবে—নিজের লোকেরা যদি মাইনে বেশি পায় তাতে তাদের অসুবিধে কি, লোকজনেরা খুশি, গোলমাল নেই। এই ফাঁকে যদি ওদের দেখিয়ে নিজের মাইনেটা বাড়িয়ে নেওয়া যায় মন্দ কি? ওর নিজের তো কিছু আসে যায় না—ও কেন সেখানে বাধা দিতে গিয়ে ঝামেলা ডেকে আনবে—। তার থেকে "বরং ওটাকে ওপরে পাঠিয়ে দেওয়া যাক, তারা যা ভালো বোঝে তাই করুক—আমি বরং আমার লোকজনের জন্য ওকালতি করব।" ওপরের লোকেরও সেই অবস্থা। আরো ওপরে পাঠাও—ক্যাবিনেটে। তারাই বা করবেটা কি? কি তাদের অপশন? কাজের হিসেব তো কবেই চুকিয়ে বুকিয়ে দিয়েছেন, ও নিয়ে কথা বলা চলে না,—লাভ লোকসান নিয়ে কথা বলা তো ক্যাপিট্যালিস্টদের কথা, তা আজকের দিনে বলে কি করে? টাকা নেই একথাটা বলা চলে না —নায্য পাওনা, টাকা নেই বলে সরিয়ে রাখা যায় না—অত করবার দরকারটাই বা কি, ওদের পকেট থেকে তো টাকাটা যাচ্ছে না বরং কিছু না করলে এখনই সব অচল হয়ে আসছে। পরের বারে আর ভোটে দাঁড়াতে হবে না। তার থেকে বরং মক ফাইট করে জনগণকে ভাল করে বুঝিয়ে,— আমরা কত চেষ্টা করেছি কিন্তু উপায় নেই বলে দিচ্ছি, এটা দেখিয়ে টাকা দেবার দাবি দাওয়া মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি? অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নাসিক প্রেসে নোট ছাপাবার অর্ডার, ফলে জিনিস-পত্তরের দাম আকাশ ছোঁয়া। ব্যবসা যখন সবটা নিজের হাতে নেই তখন ব্যবসাদার বা পুঁজিবাদের ঘাড়ে দোষ চাপাতে অসুবিধে কোথায়? হোর্ডার, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার,

পুলিস আর আমলাতন্ত্রই এর জন্য দায়ী বলে আন্দোলন করে কিছুটা ইলেকশনের ফয়দা তোলা যাবে। এ খেলাটা সমানে চলেছে, শুধু আমাদের দেশে নয় ছনিয়ার সর্বত্র, ডেমোক্রেটিক দেশে বেশি। এটা থামাবার উপায় কেউই আর খুঁজে পাচ্ছে না, সিস্টেমের মধ্যে কণ্ট্রোল বা ব্রেক বলে কিছু নেই, আপন মনে যে দিকে খুশি ছুটে চলেছে, যতদিন না সে আপনা থেকে থামে বা অন্য কেউ এসে জোর করে থামায়। তাতে সংঘাত অনিবার্য। আবার যারা এতদিন অ্যাকাউন্টেবিলিটি, লাভ লোকসানের কথা বলে নাজেহাল হয়েছিল তারা যে শুধু আড়ালে হাসছে তা নয়, পারলে কিছুটা উসকে দিচ্ছে। মরতে বসছে বাঁধা মাইনের লোকেরা, বিশেষ করে যারা ছোট ছোট শিল্পের ক্ষেত্রে কাজ করে ; তারা স্বনির্ভরশীল বাস চালায়, ভাড়া বাড়াবার উপায় নেই—ট্যাক্সি চালায়, ভাড়া বাঁধা ; ওপরে নিচে ছদিক চাপ।

দায়িত্বজ্ঞানহীন ক্ষমতার এ এক চরম নিদর্শন। তাই আজ অ্যাকাউন্টেবিলিটি কথার ওপর জোর পড়েছে, যে কাজই কর না কেন, কি কাজ কেমন ভাবে করলে তার হিসাব দিতে হবে। "জবাব দাও" শুধু বলবার অধিকার চাকুরিজীবীদের একচেটিয়া নয়, যারা মুখ বুজে সব সহ্য করে এসেছে তারাও মুখ খুলছে, তাদের মুখে ভাষা এসেছে ; আশা, তারাই ব্যাল্যান্স এনে দেবে। তবে তাদের সংহতির জোর এখন তেমন নেই, অভাবটা বেশি দিন থাকবে না। দেশের ভাল শুধু লড়াকু লোক দিয়েই হবে না, যারা কাজ জানে, তার জন্য শিক্ষা নিয়েছে তাদের হাতে দায়িত্ব দিতে হবে। তা সে যে-কোন সিস্টেমেই হোক না কেন। কম্যুনিস্ট, ফ্যাসিস্ট, ডেমোক্র্যাসি, রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, ডিক্টেটারশিপ যে নামেই তাকে ডাকা হোক না কেন? যত তাড়াতাড়ি আমরা সেটা বুঝতে পারি ততই দেশের মঙ্গল। এই তো প্রগতি। যারা ঠিক ভাবে চালাতে পারেনি বলে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে তাদের সব কিছু খারাপ ছিল না, যেটুকু ভাল ছিল তা না নিয়ে উপায় নেই, আর তারা তো সরে গেছে। কাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবেন? কতদিন আর বুলি কপচাবেন। এতদিনে সকল শিল্পপতিরা বুঝতে শিখেছে ব্যাপারটা কি।

যারা পরিচালনা বা ম্যানেজ করে তাদের বলা হয় ম্যানেজার। আর কাজটাকে বলা হয় ম্যানেজমেন্ট। চাকরির ক্ষেত্রে সব থেকে উঁচু ধাপে বসে আছে ম্যানেজমেন্ট। সব সময় একই নাম ব্যবহার করা হয় না, কৃষ্ণের শতনামের মত এরও অনেক নাম। সিনেমার রঙ্গিন পর্দা যারা পরিচালনা করে তাদের বলা হয় ডিরেকটার, ইণ্ডাষ্ট্রির ওপরের তলায় বোর্ড অব, ডিরেকটারস্, যুদ্ধের বেলায় ফিল্ডমার্শ্যাল, রাজনীতিতে নেতা, দলবাজিতে দাদা, ইউনিয়নে লিডার, যে নামেই ডাকুন না কেন এরা ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ বা অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর।

সোজা কথায় ওদের কাজ লোকজন, যন্ত্রপাতি, টাকা পয়সা নিয়ে, একটা সার্থক কাজ করা। এদের কদর এরা সার্থকভাবে কাজ করতে পারে বলে। সার্থক কথাটা কি? যে চাষী, তার কাজটা কাজের হবে ফসল পেলে এবং সার্থক হবে খাটাখাটনির ও খরচপাতির তুলনায় ফসল ভাল পেলে। যদি দেখেন আপনার খাটাখাটনি খরচপাতির বাজার-দর হচ্ছে ৫০০ টাকা অথচ ফসল আর খড়ের দামে মিলিয়ে পেলেন ২০০ টাকা তবে কি আপনি চাষ করবেন, না করাবেন? নেহাৎ দায়ে পড়ে আর ভাল কিছু পাচ্ছি না, তাই বেগার খাটা। কিন্তু ৫০০ টাকা খরচা করে যদি ১০০০ টাকার ফসল পান তবেই কাজটা সার্থক। কিছু বলতে হবে না, আপনা থেকেই আপনি সামনের বার চাষ করবেন, দু-একবার অজন্মা হলেও হাল ছাড়বেন না, জানেন পরের বারে পুষিয়ে যাবে। যে যতগুণ খরচের বেশি ফসল পাবে তার সার্থকতা তত বেশি।

চাষ ছেড়ে অন্য কাজে আসুন—বাস, মিনিবাস বা লরি চালান। নিজের টাকা আর ব্যাঙ্ক থেকে ধার করে বাসের চেচিস কিনলেন—বডি তৈরি করালেন, রুট লাইসেন্স নিয়ে ড্রাইভার কণ্ডাক্টর দিয়ে এবং নিজেও যুক্ত থেকে বাস চালাতে শুরু করলেন। লোকজনের মাইনে, তাতে আপনার মাইনেও ধরা হয়েছে—তেলের দাম, ব্যাঙ্কের টাকার সুদ, গাড়ির ক্ষয়ক্ষতি (ডিপ্রিসিয়েশন) ইত্যাদি নিয়ে দৈনিক খরচা প্রায় ৩৫০ টাকা। এখন যদি দিনে ৩৫০ টাকা না তুলতে পারেন তবে বাস বেচে দেওয়া ছাড়া

উপায় কি ? আপনি তো লোকের উপকারের জন্য গাঁটের পয়সা খরচ করে বাস চালাচ্ছেন না। আর যদি চালাতেও চান তবে কতদিন পারবেন ? টাকা না দিলে বন্ধকি বাস ব্যাঙ্ক নিয়ে যাবে। মাইনে না দিলে লোকজন সব সঙ্গে সঙ্গে কেটে পড়বে। সে-ই সার্থক ভাবে বাস চালাচ্ছে যে গড়ে রোজ ৩৫০ টাকার ওপর টিকিট বিক্রি করে। কোনদিন কম বেশি হয় না তা নয়, কিন্তু গড়ে ৩৫০ টাকা চাই-ই চাই। যখন এর ওপরে আয় হবে তখন গাড়ির চেকনাই থাকবে, গদিটাও ভাল হবে। ড্রাইভার কণ্ডাকটার কিছু বেশি কমিশন পাবে, আর আপনি আরো একটা বাস কেনার কথা ভাববেন।

কিন্তু এতে ম্যানেজ করার কি আছে, ড্রাইভার বাস চালাবে কণ্ডাকটার টিকিট কাটবে দিনের শেষে টাকা দেবে ; তার থেকে তেলের দাম ব্যাঙ্কের টাকা শোধ করলেই হোল, এখানে আবার ফালতু লোক কেন—কেন সুপারভাইজার ? টাকা বেশি আয় হলে খরচা উঠবে, না হলে উঠবে না। অন্য একটা দিক ভেবে দেখুন, আরও দশজন তো এই ব্যবসা করে সংসার চালাচ্ছে রুট লাইসেন্সের জন্য তদবির করছে, তাতে অন্তত বোঝা যায় কিছু না কিছু হচ্ছে। কিছু না হলে যারা চালাচ্ছে তারা না হয় উপায় নেই বলে চালাচ্ছে, অনেক টাকা ঢেলেছে, লোকসানে বাস বিক্রি করতে পারছে না। লোকসান যত কমে তারই চেষ্টা করছে। কিন্তু নতুন লোক আসতে চায় কেন ? এবার দেখা যাক, কারা রুট লাইসেন্সের জন্য ঘোরাঘুরি করছে, যদি লাভ কিছুটা বেশি থাকে তবে বাবুরা ঘোরাঘুরি করে, টাকা আছে, ব্যাঙ্কে জানাশুনা আছে, মাইনে করা লোক দিয়ে চালাবেন দেখাশুনা করার জন্য তিন চারটে বাস পিছু না হয় একজন সুপারভাইজার রাখবেন। যদি অতটা লাভ না থাকে তবে দেখবেন বাবুরা কেটে পড়েছে—'ওনার' ড্রাইভারের ভিড়। সে নিজেই বাস চালায়, বাড়ি বন্ধক দিয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে, সরকারি টাকা বা সাহায্য নিচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিচ্ছে বাস চালাতে এগিয়ে আসছে। উদ্দেশ্য—চাকরি তো আর চাইলেই পাওয়া যায় না, বাস হলে নিজের তো একটা হিল্লে হল, তা ছাড়া নিজেরও তো কিছু কিছু পোষ্য আছে—ভাই আত্মীয় স্বজন যারা কোথাও বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না, ঘাড়ে বসে খাচ্ছে, তাদের ওতে কাজে লাগান গেল। অনেকটা

জয়েন্ট ফ্যামিলি। যতক্ষণ তেলের খরচ আর টাকার স্থদ উঠে আসছে, চালাবে। এরা আপ্রাণ খাটছে। সকাল চারটায় বাস বের করে রাত এগারটায় গ্যারেজ করা। বাস ঝাড়া মোছা করে চকচকে রাখছে, ছোট-খাট রিপেয়ার রাত জেগে করাচ্ছে, যাতে সকালে বাস বের করতে পারে। ঝড় জল কিছুই এদের আটকাতে পারে না। ড্রাইভারের পাশে মাল তুলছে, দরকার হলে ছাদে মাল তুলছে লোক বসাচ্ছে, দরকার হলে তোয়াজ করছে। মোদ্দা কথা পয়সা উসুল করতেই হবে যেন তেন প্রকারেণ। আপ্রাণ চেষ্টা করছে, যাতে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পায়। যত ভিড়ই হোক না কেন ঠিক পয়সা আদায় করছে, লোক ডেকে তুলছে, আর নির্বিবাদে যাত্রীদের সরস মন্তব্য হজম করছে—আর মনে মনে নিশ্চয় ভাবছে,—ওরা যদি না ভাবে আমি হলে ভাবতাম, বাবুদের আর কি, কোম্পানির চাকরি করেন, লাভ হোক আর লোকসান হোক সরকারের থেকে মাইনে ঠিক পাবেন, যত দরদ নিজেদের জন্য, সরকারি বাসের জন্য প্রতি বাসে বছরে ৫০,০০০ টাকা লোকসান খেলেও বাস বাড়াও বলছেন—আর আমাদের বেলায় পাঁচ পয়সা বাড়াতে বললে "না কিছুতেই চলবে না—যাত্রী ভাড়া বাড়িয়ে জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী কিছু করা চলবে না—আমরা হাড়ভাঙ্গা খেটে টাকা রোজগার করব—সরকারের টাকা জোগাব, ওনারা বসে কি হওয়া উচিত কোন্‌টা নায্য মাইনে—বেসরকারি বাস মালিকরা কত পয়সা লুটছে তারই কাল্পনিক ছবি আঁকছেন। আমাদের ক্ষেপিয়ে তুলছেন মালিকের ওপর—আমরাও যাতে সরকারি বাসে পরিণত হই তার আকাশ-কুসুম আমাদের নাকের ডগায় ঝুলচ্ছেন।" এই স্বনির্ভর শ্রেণী চাকরিজীবীর দুচোখের বিষ, আবার তাদের না হলে চলে না—যত চোটপাট তাদের ওপর।

পয়সা যদি রুটে না থাকে তবে কি রুটে বাস চলে না? চলবে না কেন, নিশ্চয় চলে, যে রুটে যেরকম পয়সা সে রুটে সেই রকম বাসই চলে, নতুন বাস চলে ভাল রুটে, আর যেখানে পয়সা কম সেখানকার বাস ঝড়ঝড়ে, লোক চাপাচ্ছে আস্টেপৃষ্ঠে। ম্যানেজার বা স্থপারভাইজারদের এখানে কি দেখতে হচ্ছে? দেখছে সকলের টিকিট কাটা হয়েছে কিনা, কাটলেও ঠিকঠিক দামের টিকিট কেটেছে কিনা, বাস পুরো লোক নিয়ে যাচ্ছে কিনা—:পেলে মালপত্তর নিচ্ছে কিনা, বাস যত্ন করে চালাচ্ছে কিনা, কাঁচা

পয়সার ব্যাপার কাউকে ঠিক বিশ্বাস নেই, সকলকেই চোখে চোখে রাখতে হয়। তেমনি খরচের দিকটা সামলাতে হবে, যতটা তেল কিনেছে বলছে ততটা কিনেছে কিনা, নিয়ে থাকলেও কিছুটা বিক্রি করে দেয়নি তো, মবিল কিনে সময়মত ঢালছে কিনা, সাপ্লাই তো লেগেই আছে, ঠিক ঠিক স্পেয়ার পার্টস বসাচ্ছে তো? প্রতিটি দিকে চোখ রাখতে হয়। তার পরে সময় মত লাইসেন্সের ফি দেওয়া, ট্র্যাফিক পুলিশের সঙ্গে দেখা করা, কোথাও কিছু হলে সামলাবার জন্য ছুটে যাওয়া, কে কোন্ দিন কাজ করবে ঠিক করে দেওয়া। কেউ না আসতে পারলে বদলি লোক দেওয়া, নিজেদের এসোসিয়েশনের কাজ দেখা, টাইমের হিসেবে পয়সা কতটা কম বেশি হচ্ছে দেখা, ইউনিয়নের সঙ্গে বোঝাপড়া করা। এতসব সামলে চালানোটাই সার্থক চালানো, বাপের পয়সা আছে, পয়সা দিয়ে রুট লাইসেন্স নিলাম, মাইনে আর কমিশনে লোক রাখলাম আর মাস গেলে লোকসান দিলাম তার মধ্যে কোন সার্থকতা নেই। ওকে মানিয়ে চলতে হবে দশের সঙ্গে, হাসি মুখে না পারলে মুখ বুজে সহ্য করতে হবে যাত্রীদের টিটকারি, "উনি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাস কেন জোরে চলছে না, গরমে সব অস্থির হচ্ছে, অন্য বাস কেন এগিয়ে গেল, কেন যাত্রী নিতে বাস থামল, কেন হাত দেখেও বাস থামালো না, কেন সময় নিয়ে যাত্রীদের নামালো না, কেন দুবার করে টিকিট চাইছে, ওঠার সঙ্গে সঙ্গে টিকিট, একটুও তর সইছে না", সব কিছু সাময়িক ছোটখাট কথা, স্রেফ কথার কথা, কিন্তু নতুন ড্রাইভার আর কণ্ডাকটার হলে কথা শুনে মাথা গরম করে, কিছু দিন পুরোনো হলে সব সয়ে যায়, এ ছাড়াও আছে চাঁদার ব্যাপার, পূজোতে, মিটিংএ ফাংশনে, এত সব মানিয়ে চলতে হবে, আর সংসার চালাতে হবে। আর কোন সহজ উপায় জানা নেই, থাকলেও সেটা পাচ্ছে না, ওগুলো সব বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির একচেটিয়া। এরাই সার্থক পরিচালক।

সার্থকভাবে চাষবাস ম্যানেজ করা আরো শক্ত, তা যদি না হত তবে লোকে চাকরি চাকরি করে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতো না, সবাই গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে ভিড় করত না। শক্ত হবার কারণ অনেক, প্রথমে আমাদের ধারণা চাষ যারা করবে তারা তো গরিব হবেই; তাদের ছেলেরা লেখপড়া করবে, তাদের বাড়ির মেয়েরা সায়া সেমিজ পরবে, সিনেমা যাবে, রেডিও

থাকবে, হাতে ঘড়ি পরবে, টেরিলিনের শার্ট পরবে এ তো আমাদের ধারণার বাইরে, তাদের তো বাপ দাদার আমল থেকে গামছা পরে ঘুরতে দেখেছি। অথচ বুঝতে চাই না আজকের দিনে খাবারের তুলনায় ওসবের দাম কিছুই নয়, ওদেরও তো শখ থাকতে পারে। আর পরবে না-ই বা কেন, ওগুলি কি চাকুরেবাবুদের একচেটিয়া ? অথচ মজা এই যে আমরা ওটা সহ্য করতে পারি না। আর একটা কারণ গ্রামে গরীব লোকের অসম্ভব ভিড়—যাদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে সব পার্টিই মুনাফা লুটতে চায়, ওদের মধ্যে ঝগড়া ঝাঁটি লাগিয়ে, ঈর্ষা জাগিয়ে প্রায় অচল অবস্থায় এনে ফেলেছে। সবার থেকে বড় কারণ ওরা দল পাকাতে শেখে নি, আর কাজ না করে দেশকে অচল করতে যাবার মত সুযোগ ওদের নেই। সে সুযোগটা তাদের, যারা শহরের কাছাকাছি থাকে আর যারা যত ভাইট্যাল জায়গায় কাজ করে। গলা যে চেপে ধরেছে, যারা সব নিজের লোক, তাদেরই তো আগে দেখতে হবে, কে কোন্ গাঁয়ে বসে কাঁদছে সে নিয়ে কে ভাববে ? আর ওরা যদি বাড়াবাড়ি করে ওদের মারণাস্ত্র ওদের ঘরের পাশেই আছে, একটু উসকে দিলেই হল। আর একটা জিনিস আমরা ধরে নিয়েছি জমির টাকা ক্যাপিট্যাল নয়, তার কোন সুদ থাকতে পারে না। পোস্টাফিসে টাকা রাখলে সুদ পাবে, কিন্তু জমির জন্য যে টাকা তার কোন সুদ পাওনা হয় না। যেমন, ধানের পাটের দাম বাঁধা হয় শুধু খরচা খরচের হিসেব, জমির টাকা, হাল বলদের টাকা, সারা বছর গরু সামলানো আর নিজের বউ ছেলেমেয়েদের খাটনি কাউ, "ওতো বাড়িতে থাকলে করতেই হয় ও আবার কি হিসেবে পড়বে"। ওদের হিসেব ফ্যামিলি ধরে আর শহরে হিসেব আলাদা আলাদা করে।

এবার দেখা যাক চাষীকে কি ম্যানেজ করতে হয়। আমি চাষীই বলছি, কেননা আজকাল যেখানে জমির উর্ধ্বসীমা ২৫ বিঘা সেখানে লোক লাগিয়ে চাষ করবার মত লোক থাকবার কথা নয় ; যারা খাটে খাটায়, নিজে হাতে কাজ করে তারাই থাকতে পারে। এদের মধ্যে যারা অবস্থাপন্ন তাদের গড় জমি ২০ বিঘার বেশি নয়। এখন পর্যন্ত যত সরকারি হিসেব দেখা যায় যত রকমের চাষের কথা বলা হয় সব কিছু করলেও—তা সে ফলের বাগান করুক বা মাছের চাষ করুক বিঘা প্রতি বছরে একহাজার টাকার বেশি উৎপাদন করতে পারবে না। নীচের দিকে শুধু আমন ধানের চাষ

করলে তিনশ টাকা, গড়ে সাতশ টাকা। অর্থাৎ বছরে চোদ্দ হাজার টাকার ফসল ফলবে, তার থেকে আনুষঙ্গিক খরচ খরচা বাদ দিয়ে আট হাজার টাকা নিজের খাটাখাটনির বদলে রাখতে পারলে সত্যিই বাহাদুরি বলব। এই ভাবে চাষ করতে হলে কতটা জানতে হবে আর কতটা খাটতে হবে সে তো সকাল বিকেলের চাষী-ভাইদের আসর শুনলে একটা ধারণা করতে পারবেন। কত রকমের বীজ, কত রকমের তার শোধন, বেছে নিতে হবে কোন্‌টা আপনার পক্ষে সুবিধে হবে, কি ভাবে বীজতলা করতে হবে, কত তার যত্ন, লাঙ্গল দেবার সময় কি কি সার মেশাতে হবে, জমির সঙ্গে সমতা রেখে কি কি সার দিতে হবে কতটা দিতে হবে, কোন্ সময় কতটা কীটনাশক ওষুধ দিতে হবে, সব কিনে এনে আগের থেকে জোগাড় করতে হবে, চাষের সঙ্গে নিড়ানি, জল, সেচ, পোকার হাত থেকে বাঁচানো, চুরির হাত থেকে রক্ষা তো আছেই, আরও একটা বড় কথা হচ্ছে সময় মত বিক্রি করে ধার শোধ করা। এছাড়া অনিশ্চয়তা চাষের বড় বাধা, কবে বৃষ্টি হবে কতটা হবে কেউই সঠিক বলতে পারে না ; আগে যদি বীজতলা করেন আর বৃষ্টি যদি দেরিতে হয় ততদিনে বীজ বুড়ো হয়ে যাবে ফলন হবে কম, তাই কয়েক সপ্তাহ পর পর বীজতলা করতে হবে যাতে বীজ তোলার আর লাগাবার সময়-সীমা না পেরিয়ে যায়। এর পরে আছে আকাশের দিকে চেয়ে থাকা। খরা তিন চার বছরের মধ্যে এক আধবার হবেই, তবে কোন্‌বার হবে কে জানে? যদি হয়, খাটাখাটনি যে মাটি হল সেটা বড় কথা নয় গাঁটের বা ধার করে যে টাকা খরচ করে যে সার ওষুধ দেওয়া হয়েছে সবটাই নষ্ট। সে ধাক্কা সামলাতে পারবে না বলে অনেকেই সেদিকে পা বাড়ায় না, বাবু চাষীরা তো নয়ই, যতক্ষণ না ঘরে ফসল উঠছে ততক্ষণই দুশ্চিন্তা। এত করে যে চাষ করে ফসল তুলছে তার হয়ে বলার কেউ নেই, জুট মিলে সবচেয়ে কম কত মাইনে হবে সেটা নিয়ে আন্দোলনের বিরাম নেই—কত কত মিটিং, কবে থেকে তা দেওয়া হবে তারই ফায়সালা ; আর চাষীর বেলায় এবার জুট করপোরেশন টাকার অভাবে—গুদামে মাল জমে যাওয়াতে পাট কিনতে পারবে না বলেই খালাস। কিন্তু চাষীভাই কি করবে? তার তো বিক্রি করে ধার শোধ করতে হবে, ধান কিনতে হবে, আবার পরের চাষের সব কিছু জোগাড় করতে হবে। সে যাবে কোথায়? জলের

দরে বিক্রি করা ছাড়া তার আর উপায় কি? তলাকার দাম বেঁধে দেওয়া বা মাইনে বেঁধে দেওয়া তার কাছে রসিকতা ছাড়া কিছুই নয়, তাকে খেটে খেতে হবে, বিক্রি করতে হবে যা পাবে তাতেই। বাবুরা যখন শুনতে চান বাবুদের মনের মত কথা বলে, সে জানে বাবুরা দরকারের সময় ঠিক সরে থাকবে, তার পর বিক্রি বাটা হয়ে গেলে বলবে, "কেন তুই এত কমদামে ছাড়লি, যদি কিছু থাকে তো নিয়ে আয় আমি মহাজনের থেকে বেশি দাম দেব"। এরি মধ্যে আমাদের চাষী ভাইরা ম্যানেজ করছে, কি করে যে করছে? কোন হিসেবে মেলে না, শুধু এক হিসেবে মেলে—"পেটের দায়ে —আর কোন কিছু ওর জানা নেই—পাচ্ছে না"—তাই ওদের ছেলেরা কেউ ওদিকে ঘেঁসতে চায় না, সবাই পড়াশুনা করে চাকরির ধান্ধায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। এত ভূতের বেগার খাটবে কে? যে কোন চাকরি, তা যত কম মাইনের হোক না কেন, এর থেকে অনেক গুণ ভাল, জীবন হবে অনেক সুখের। সব থেকে কম মাইনের চাকরির মাইনেও চাষের দুগুণ।

আপনি একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন, আমাদের দেশে যারা কৃষি ভিত্তিক কাজ করে তাদের অবস্থা কতটা খারাপ, বিশেষ করে শহরের তুলনায়। তাই শহরে শহরে এত লোকের ভিড়; মরুভূমির মাঝে শহর হচ্ছে মরূদ্যান, তার চাবিকাঠি হচ্ছে চাকরি। পারেন তো সেইটাই যোগাড় করুন। অত ঝামেলায় যাবেন কেন? কেন ফাঁপা জোতদার হবেন?

শ্রেণী বিন্যাস

বন্য যুগে মানুষ নিজের স্বার্থ ছাড়া কিছুই বুঝত না। এই পৃথিবীর সব কিছুই দেখত নিজের কতটা কাজে লাগে সেই দিক থেকে। ভগবান যা কিছু দিয়েছেন সব কিছু তার নিজের উপকারের জন্য, সব কিছু তিনিই জুটিয়ে দিয়েছেন, গাছে গাছে ফল, জলে মাছ, বনে শিকার, সব কিছুই। তাতে যদি ভাগ বসাতে অন্য কেউ আসে তার আর রক্ষা নেই, বনের বাঘের মতই সে হিংস্রভাবে নিজের এলাকা সামলে রাখত। তবে নিজের প্রেয়সী বা স্ত্রীর বেলায় কিছুটা নরম, কাম দেবতার অনুগ্রহে, সব সময়ে নয়

কামনার সময়। পরে স্ত্রীর ওপর একটু নরম হলেও বাচ্চাদের সহ্য করতে পারত না, তাকেও একজন ভাগিদার হিসাবেই দেখত। আমাদের বাড়ির বিড়াল যেমন বাচ্চাগুলোকে হুলোর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে, মুখে করে আজ এখানে কাল ওখানে লুকিয়ে রাখে অনেকটা সেই রকম ভাবে মাকে সন্তান বাঁচিয়ে রাখতে হত। কিছুদিন পরে মানুষ আরও একটু নরম হয়েছে, বুঝতে পেরেছে একা এই দুনিয়ায় সব কিছু সামলানো যাবে না, দল বাঁধতে হবে, শুধু খাদ্যের জন্য নয় অন্য দলের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ; নিজেদের সংখ্যা বাড়াবার জন্য, তখন থেকে সন্তানের ওপর কিছুটা মায়া হোল —বিশেষ করে মেয়েদের ওপর, তারাই তো আগামী দিনের প্রণয়িনী, কিন্তু মদ্দাদের তাড়িয়ে বেড়াত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে—বানর বা হনুমান সমাজে আজও তাই দেখা যায়। পরে অবশ্য বুঝতে শিখল সব মদ্দাদের তাড়িয়ে দিয়ে শুধু মেয়েদের দিয়ে নিজের রাজত্ব সামলানো চলে না। মেয়েগুলো তো বীরভোগ্যা। তারা তো লড়াইয়ের সামিল হয় না, বরং চারদিক ঘিরে চুপ করে দেখতে থাকে, লড়াই খতম হলে যে জিতল তারই সঙ্গে চলল, পরাজিতের দিকে ফিরে তাকাবার কারণ তো কিছু নেই, সেও তাদের কথা কোনদিন ভাবেও নি, ভাববেও না। বনের অনেক জন্তু জানোয়ার হরিণ, বন্য ছাগল সেই ভাবে থাকে। তার পরের ধাপে মানুষ এখন অন্যদের কিছুটা সহ্য করতে শিখেছে। অবশ্যই বাঁচায় তাগিদে সব সন্তানকে কম বেশি বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, নিজে ছাড়া অন্য পুরুষদের সঙ্গে মানিয়ে চলছে, ধরেই নিয়েছে ওদের কিছু প্রণয়ী থাকবে। ও একা আর কতজনকে সামাল দেবে, তবে হ্যাঁ মাতব্বরি ছাড়তে রাজি নয়। দলের সর্দার সেই থাকবে, যা কিছু হবে তার ইচ্ছাতেই হবে, শুধু দলের ভেতরকার ব্যাপারে নয়, বাইরের ব্যাপারেও—তা সে লড়াই হোক, শিকার হোক, লুটপাটের ভাগই হোক।

এদের গোষ্ঠী বা ট্রাইব বলা হয়, ট্রাইব্যাল ওয়ার এখনো সমানে চলেছে পৃথিবীর নানা জায়গায়। এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, তাদের সামান্য খাবারের ভাগিদার মনে করে। ওরা খেলে নিজেরা বাঁচবে কি করে। তাই লড়াই—কেউ মরলে তার মাংস দিয়ে ভোজ—আবার ভোজের মাংসের জন্যও লড়াই। আমরা ছাগল

মুরগীর মাংস খুব জমিয়ে খাই, সেই রকমই। তাদের মাংস না খাবার তো কোন বিশেষ কারণ নেই, শুধু খানিকটা মাংস নষ্ট করা, ভগবান যে ওদের যুদ্ধে জিতিয়েছেন তার কারণ ওরাই ভগবানের নিজের পছন্দ মত গোষ্ঠী। পৃথিবীটা ওদের জন্যই।

এই রকম ভাবেই চলছিল। লোকসংখ্যা বাড়বার কোন সুযোগ ছিল না। খাদ্য তো সীমিত, তাতে যত জন থাকতে পারে তার বেশি তো হতে পারবে না। এরই মধ্যে কিন্তু খাদ্যের বেলায় একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে, কোন এক গোষ্ঠী প্রকৃতির ওপরে নির্ভর না করে চাষ করতে শিখেছে, বীজ সংগ্রহ করে সময় মত জমিতে পুঁতে জল দিয়ে অনেক খাদ্য তৈরি করছে। জঙ্গল আর শিকারের ওপর নির্ভরশীলতা কমেছে, অল্প জায়গাতে অনেক ফসল ফলাচ্ছে, বাড়বাড়ন্ত অবস্থা, আবার কোন গোষ্ঠী পশুকে পোষ মানাতে শিখেছে, তাদের চড়িয়ে, বন্য জন্তুদের হাত থেকে সামলে সংখ্যা বাড়তে শিখেছে, এখন আর শিকারে যাবার অতটা দরকার নেই, ঘরে ভাত মাংস মজুত, দুধ খেতে শিখেছে, ডিম খেতে শিখেছে, তবে হৈ হৈ করে আগেকার দিনের মত মাঝে মাঝে শিকারেও যায়। এ সমস্ত কাজ, চাষ, গরু চরান অবশ্য পুরুষের কাজ নয়, যত সব একঘেঁয়ে কাজ, মেয়েদের জন্য তোলা, পুরুষের জন্য আছে যুদ্ধ, শিকার আর শক্ত শক্ত কাজ। এই সময়ে ভাবল শত্রুকে মেরে তার মাংস খাওয়া থেকে তাকে দিয়ে একঘেয়ে আর ভারী কাজ করিয়ে নিতে পারলে ফয়দা অনেক। তাই তাদের না মেরে খাটাবার জন্য দাস করে রাখতে লাগল, যুদ্ধবন্দীদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে লাগল, যার হাতে যত লোক তার তত সুবিধে। যুবক-যুবতীদের রাখলেও বুড়ো এবং বাচ্চাদের বাঁচিয়ে রাখার দরকার অনুভব করেনি, মেরেই তাদের সাবাড় করতে আটকাচ্ছিল না। এটা তো আমরা সেদিন পর্যন্ত দেখেছি ক্রীতদাসের ব্যবসা, আফ্রিকা থেকে লাখো লাখো লোককে আমেরিকায় চালান দেওয়া হয়েছে, ছাগল গরুর মত মানুষ কেনাবেচা হয়েছে, হয় তো বা খানিকটা অন্য ভাবে আজও কোথাও কোথাও তাই হচ্ছে। মাংস থেকে ওর শ্রমের সুবিধে অনেক বেশি বোঝার সঙ্গে সঙ্গে নির্বিচারে হত্যা বন্ধ হোল, বন্দীরাও বাঁচবার সুযোগ পেল। এমন কি, অসভ্য আর বর্বরতার চূড়ান্ত বলে গণ্য হোল মানুষের মাংস খাওয়া। বরং বন্দীদের

কাজে লাগাও "গেলি স্লেভ", "পিরামিড বানান", ''খনিজ কাজ'', ''পাথর ভাঙ্গার কাজ", "গ্ল্যাডিয়েটার" এই সব কাজে।

এবার দেখা যাক এদের মধ্যে মাতব্বরি কে করছে, কাদের স্বার্থে করা হচ্ছে। গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম দিকে দলপতি হয়েছে যার গায়ের জোর বেশি, যে ভাল শিকার করতে পারে, যে যুদ্ধে শত্রুকে হারাতে পারে, তবে সব সময় একা নয় দু চার জন মিলে। গায়ের জোর তো বেশিদিন থাকে না অথচ যে একবার লিডার হয়েছে, তার সুযোগ সুবিধে সম্মান ভোগ করেছে, সে তা আর ছাড়তে রাজি নয়, সেটাকে বাঁচাবার জন্য দলের মধ্যে দল গড়তে শুরু করল, সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ে, যে ভাল যুদ্ধ করতে পারে তাকে সেনাপতি, যার বুদ্ধিতে চললে সুবিধে তাকে মন্ত্রী, যে যুদ্ধ জয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ এনে দিতে পারে তাকে পুরোহিত, যে দলটাকে সামলে রাখতে পারে তাকে কোটাল, যে অসুখ বা ক্ষত হলে সামলাতে পারে তাকে চিকিৎসক. মোট কথা যারা সঙ্গে থাকলে দলের সুবিধে হবে তাদের বড় বড় উচ্চ পদে বসান হল—যাতে সকলে মিলে ওদের জায়গা বা পদে আজীবন বাহাল ভবিষ্যতে থাকতে পারে, এবং সেটাকে করা হল বংশ পরম্পরায়, বাপের কাছ থেকে ছেলে পাবে, এটা অবশ্য দেখে রাখল যাতে নিজেদের আপন লোক ভাই, কাকা আত্মীয় স্বজন ওই পদগুলি পায়। এইরকম ভাবে শাসক শ্রেণী বা রুলিং ক্লাসের জন্ম। গোষ্ঠির আর সবাইকে পদের সুবিধের জন্য কাজ করতে হবে, ওদের ইচ্ছামত, তা সে যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া, বা দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আত্মত্যাগ, সব কিছুই। গোষ্ঠী মানেই দলপতির দল, সব কিছু সম্পত্তি গরু ঘোড়া জমি, বন জঙ্গল তাদের ভোগের জন্য, তাদের আনন্দ বিধানের জন্য, তাদের মহিমা প্রচারের জন্য। তারা যতটা দলবদ্ধ ছিল, নিজেদের ঈশ্বরের সমান মনে করত তার উদাহরণ মিশরের সুবিশাল পিরামিড, যেখানে রাজার সঙ্গে রাজার সঙ্গী-সাথী স্ত্রী ধন দৌলত সবাইকে এক সঙ্গে মরতে হত, না মরে অবশ্য উপায়ও ছিল না, কারণ ছেলে রাজা হলে তার সঙ্গী সাথীরাই সব কিছু ভোগ দখল করবে, ওদের সরে যেতে হবে, সেরকম ভাবে বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল। এখানেই প্রথম শ্রেণী বিভাগ, রুলিং ক্লাস আর তার সার্ফ বা প্রজা। নিজেদের ওরা জনসাধারণের কাছ থেকে আলাদা করে রাখতে শিখল। অবশ্য প্রজারা যে সবাই একই হালে

ছিল তা নয়, কে কিরকম কাজে লাগবে সে হিসেবে সুবিধেও কমবেশি পেত। প্রভুর সেবাই জাগতিক সুখের এমনকি পারমার্থিক সুখের একমাত্র চাবিকাঠি। যখন গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াই তখন অবশ্য রুলিং ক্লাসকে প্রাণ দিতে হত, চোটটা ওদের ওপরেই বেশি পড়ত, বাঁচার উপায় ছিল বিজয়ীর কাছে সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে সব কিছু তুলে দেওয়া। বিজয়ী যদি কাউকে দয়া করে তার তাঁবেদার করে নেয় তবেই প্রাণ রক্ষা, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিজয়ী তাদের হাতে রাখবার জন্য নিজেদের কারও দ্বারা ওদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক পাতাত,—সমান স্তরে, প্রজার সঙ্গে নয়। শ্রেণী বিভাগ ভাঙবার কোন ইচ্ছা থাকত না, কারণ তারা এর সুবিধের পুরো সুযোগ নিত। এরা আজ পর্যন্ত রুলিং বা ল্যাণ্ডেড অ্যারিস-টোক্র্যাসি, ফিউডাল লর্ড বা রাজরাজড়ার জাত নামেই পরিচিত।

ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বণিকের হাতে অনেক টাকা আসতে লাগল, তাদের ধন দৌলত নেহাৎ ফেলনা ছিল না, প্রথম প্রথম যদিও রাজাকে খুব মান্য করত, পরে পরে অতটা আর করত না, নিজেরাই শহর তৈরি—সিটি স্টেট তৈরি করে, লোকজন রেখে সম্পদ রক্ষা করতে শুরু করল, ওদের হাতে অগাধ টাকা, বেশি জোর ওদের ওপর খাটে না, প্রায়ই যুদ্ধের খরচ সামলাবার জন্য ওদের কাছে হাত পাততে হয়, তাই সমাজে ওরা প্রতিষ্ঠা পেল তবে আলাদা শ্রেণী হিসেবে। এই বণিক শ্রেণী নিজেদের মধ্যে খুব একজোট হয়ে থাকত, বিয়ে সাদি সব নিজেদের মধ্যে, ওদের লাভের ব্যবসাতে যাতে কেউ ভাগ না বসাতে পারে তার জন্য দলে বাইরের কাউকে নিত না। এরাই শিল্প গড়ে তুলল নিজেদের স্বার্থে, আর শ্রমিক শ্রেণী সামলাবার এবং জমি শুল্ক থেকে সুবিধে পাবার জন্য রাজার জাতকে কিছুটা সঙ্গে নিতে বাধ্য হল। এরা অবশ্য ভগবানের প্রতিভূ বলে নিজেদের মনে করত না। আবার রাজারা রাজত্ব করাটাই বেশি সম্মানজনক মনে করত, তবে টাকার দরকারে বণিকের মারফতে মোটা আয়ের ভালে থাকত। বণিকেরা অবশ্য জাতে ওঠার জন্য অনেক টাকা খরচ করে ওদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাত।

তিন নম্বর শ্রেণী শুরু দুশো বছরও হবে না, শিল্প ও আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে। এরা বেশির ভাগই প্রফেশন্যাল, উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক,

ইঞ্জিনিয়ার, গাইয়ে, বাজিয়ে, যোদ্ধা, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ম্যানেজার, শিল্পী, ভাস্কর ইত্যাদি। এদের প্রথম পরিচয় যে এরা সবাই নিজের গুণে এখানে এসেছে। কাজ জানে তাই খাতির, সব দেশে সব জায়গায়, এদের জন্য রাজারাজাদের রেষারেষি কে কাকে রাখতে পারল, অতি খাতির করে এদের রাখা হত অবশ্য চোখে চোখে। নিজেরদের সম্বন্ধে ওদের খুব উচ্চ ধারণা, কেউ কাউকেও সহজে বড় বলে মানতে রাজি নয়, সবাই এর 'একলা চলো'রে ভাব—কিছুতেই দল বাঁধতে রাজি নয়। হবেই না বা কেন, ওরা তো জন্মসূত্রে বা টাকার জোরে এই পজিশনে আসেনি, এসেছে স্রেফ নিজের গুণে। ওপরকার দুই শ্রেণীর প্রতি এদের কোন মোহ নেই—রাজা যে স্বশরীরে ঈশ্বরের প্রতিভূ তা এরা মানতেই রাজি নয়, স্রেফ ভাঁওতা। এরা ঠিক শ্রেণীগত বা জন্মগত পার্থক্য মানতে রাজি নয়, যে কেউ এদের দলে ভিড়তে পারে নিজের গুণে। টাকার প্রতি মোহ থাকলেও আইডিয়ালের ওপর বেশি জোর দেয়, এরাই দেশের মিডল ক্লাস, চাকরিজীবী। আর প্রফেশন্যাল, তারা এই গ্রুপে পড়ে। এরা মনে করে দেশের সব উন্নতির মূলে এরাই। তবে রোজগার অনুযায়ী উচ্চ আর নিম্ন মধ্যবিত্ত বলে প্রায়ই ওদের ভাগ করা হয়। এদের আর একটা বিশেষত্ব এরা বেশিরভাগই বুদ্ধিজীবী, নিজের হাতে কাজ করাটা বা শারীরিক কাজ এরা নিচু চোখেই দেখে।

এর পরের ধাপে আছে শ্রমিক শ্রেণী, শিল্প-শ্রমিক, এদের মধ্যে অনেকের অবস্থা ভাল, অনেক বেশি সুখসুবিধা আজকাল পাচ্ছে; যা কুটির শিল্পী বা চাষীরা পাচ্ছে না। এদের মধ্যে কে কোন্ কাজ করে সে হিসেবে শ্রেণী বিভাগ থাকলেও নিজেদের শ্রমিক শ্রেণী বলেই ভাবে—একজন আরেক জনের জন্য অনেক কিছু করতে রাজি—ফেলো ফিলিংস নিজেদের মধ্যে খুব বেশি, যা ও অন্যায় মনে করে তা তাকে দিয়ে কিছুতেই করান যাবে না, টাকা দিয়ে তো নয়ই। মিডল ক্লাসের মতো ওরা চাকরির অতো পরোয়া করে না, খেটে খাবে, যেখানে যাবে সেখানে পাবে, টাকা হয়তো কিছু কম আর বেশি—তা বলে মান ইজ্জত খুইয়ে ওরা কাজ করতে রাজি নয়। দুঃখে ওদের জীবন গড়া, দুঃখকে ওরা মোটেই ভয় পায় না, অন্য শ্রমিকের যাতে অসুবিধে হয় সে কাজ ওরা কিছুতেই করবে না, অন্যের ভাত মারবে না। টেলার সাহেব অতটা না ভেবে বোনাস আর টাইম স্টাডি নিয়ে মাতামাতি

করে তাই অতটা সুবিধে করতে পারেন নি, বুঝতে পারেন নি ওদের ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান কত বেশি, তার জন্য ওরা কতটা ছাড়তে পারে।

এই আলোচনায় এই কথাগুলি গুছিয়ে দেখাতে চাই :—

(ক) গোষ্ঠী বা রেসের মধ্যে অনেকে মনে করে দেবতা শুধু ওদেরকেই পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ ভোগ করবার জন্ত বানিয়েছে, অন্যরা সব নিকৃষ্ট—বাঁচবার কোন অধিকার নেই।

(খ) জমিদার আর শিল্পপতিরা মনে করে তা সে নিজের গোষ্ঠীরই হোক আর সবাই জন্মেছে ওদের সেবা করার জন্য।

(গ) প্রথম দিকে যুদ্ধে পরাজিত সবাইকে বন্দী বা ক্রীতদাস হিসেবেই রাখা হত।

(ঘ) এর পরে এদের ভাগচাষী বা ভূমিদাস হিসেবে দেখা হত।

(ঙ) এর পরে এদের ঠিকেদাস বা ইনডেঞ্চার্ড লেবার হিসেবে বাইরে চালান করতে লাগল।

(চ) এর পরে এরাই শ্রমজীবী—উদয়াস্ত খেটেছে। দিনে ১২ থেকে ১৪ ঘণ্টা খাটে অথচ দুবেলা দুমুঠো ভাত জুটত না, সবাইকে বাবুদের বাড়িতে কাজ করতে হত।

(ছ) এই অবস্থা জিয়িয়ে রাখবার জন্য বিদেশ থেকে সস্তায় মজুর আমদানি করা হল, দরকার হলে শিল্পকে সরিয়ে নেওয়া হতে লাগল।

(জ) শ্রমিকরা যাতে জোট না বাঁধতে পারে তার জন্ত পালোয়ান আর লাঠিয়াল রাখল।

(ঝ) শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে একদলকে আরেকদলের বিরুদ্ধ উস্কান হল।

(ঞ) পুলিসি অত্যাচার—শ্রমিক বিরোধী আইন প্রণয়ন আর নির্যাতন সমানে চলল।

ওদের দেখেই কবিগুরু লিখেছেন—

স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার, সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে। ঐ যে দাঁড়ায়ে নতশির

মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী। স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার
তারপরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত হানে গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।

আন্দোলন

বঞ্চনা ও অত্যাচারের হাত থেকে পার পাবার জন্য আন্দোলন সমানে চলে আসছে, যে যে সময়ে, যে ভাবে যারা বঞ্চিত হচ্ছিল তারা বঞ্চনার হাত থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য সমবেত ভাবে প্রচেষ্টা করছিল। যুগে যুগে সামাজিক ও আর্থিক পরিবর্তনের সঙ্গে সেই আন্দোলনও নানা রূপ নিয়েছে। বঞ্চিতদের সকলে একই শ্রেণীর নয়, তাদের বঞ্চনাও একই রকমের নয়, তাই বিশেষ বিশেষ শ্রেণী তাদের সুবিধে সামর্থ্য মত লড়াই চালাচ্ছিল, তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য। প্রথম দিকে দলের থেকে কয়েক জন একসাথে বেরিয়ে এসে নিজেরাই আর একটা দল গড়ছিল, যাতে তারা সুযোগ সুবিধে পায়, নিজেরা দলপতি হতে পারে। আজকালকার দিনে যেমন বড় বড় পূজো কমিটি ভেঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় অনেকগুলি কমিটি হয়, অনেক পূজো, তার মূলে হচ্ছে এক পূজোতে তো বেশি লোক মাতব্বরি করতে পারে না, অথচ সেটা করবার, নিজেরা যে ভাল কিছু করতে পারে সেটা দেখাবার জন্য পুরোন কমিটির থেকে দলছুট আর নতুন লোক নিয়ে নতুন

নতুন পূজো শুরু করল। প্রত্যেক দল আরো ভালো করে আরো ভালভাবে সাজিয়ে পূজার প্রতিযোগিতায় নামল। তবে পূজোর বেলায় ছোট ছোট দল হলে মাতব্বরির সুবিধে হতে পারে, কিন্তু শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে খুবই অসুবিধে, তাই শত্রুর হাত থেকে নিজেদের বাঁচতে বড় দল গড়ার দরকার, বিশেষ করে প্রাণের দায়ে। সম্পত্তি আর যা কিছু ভাল রক্ষা করবার জন্য বড় দলের প্রয়োজন হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে লাগল। তারই তাগিদে ছোট ছোট দলকে কিছু বেশি সুযোগ সুবিধে দিয়ে, সকলে মিলে একজনকে দলের সর্দারদের সর্দার বানাল, দলের বাইরে কাউকে নয়, সর্দারদের মধ্যে যে বেশি শক্তিশালী সব থেকে সুযোগ্য তাকেই সব দল বড়সর্দার বলে মেনে নিতে রাজি। যারা সমবেত হতে পারল না তারা—নিজেদের ছোটখাট সুযোগ সুবিধে ছাড়তে রাজি হচ্ছিল না বা সকলের সঙ্গে অহঙ্কারে ঈর্ষায় বশে এক হতে পারছিল না তারা সমবেত শত্রুর কাছে হারতে লাগল, হয় সবংশে নিধন, না হয় পলায়ন, না হয় বশ্যতা স্বীকার করে অনেক কিছু ছেড়ে দিয়ে মান-ইজ্জত সম্পত্তি—নানা রকমের ক্ষতি ভেট দিয়ে প্রাণ বাঁচাল। এই সমস্ত লড়াইয়ে বেশির ভাগ প্রাণ হারাতে লাগল রুলিং ক্লাস, যারা ক্ষমতায় থেকে সব কিছু সুযোগ সুবিধে একচেটিয়া করে রেখেছিল, প্রজা আর ক্রীতদাসদের খুব বেশি কিছু যেতো আসতো না, নতুন যে সর্দার হয়েছে সে তার হয়ে খাটতে লাগল, তারাও তো 'সম্পত্তি' আর লড়াই সম্পত্তির জন্য তাই যুদ্ধের হিড়িকে লুটপাট আর কিছু সুন্দরী মেয়ে বা বউ হারান ছাড়া, যাবার তো বিশেষ কিছু ছিল না। বরং নিজেদের রাজা অত্যাচারী বা অকর্মণ্য হলে তারা তলে তলে বা খোলাখুলি ভাবে আক্রমণকারীকে সাহায্য করতে, কিছু বেশি সুযোগের আশায় বা প্রাণ বাঁচাবার আশায় সাহায্য করতে লাগল, পালাতে হলে রাজা আর দববলকে পালাতে হয়, মরতে হলেও তাদের, সম্পত্তি গেলেও তাদের। লড়াইটা তো রাজায় রাজায়—কাছাকাছি কিছু উলু-খাগড়ার প্রাণ যেতে পারে, যারা দূরে থাকত তাদের খুব বেশি কিছু হত না। বরং এই সুযোগে কিছুটা গুছিয়ে নেবার তালে থাকত। সৈন্যের পেছনে পেছনে চলত লুটেরার দল, লড়াই শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা শকুনির মত ঝাঁপিয়ে পড়ত পরাজিতের ওপর, এখানে নিজের দেশের বা দলের লোক বলে কোন বাছবিচার নেই, এমনকি ব্যাপার সুবিধের নয় দেখলে নিজ দলের

সৈন্যেরাও অপর দলের সঙ্গে বা লুটেরার সঙ্গে ভিড়ে কিছু লুট করে নিতে পেছ্নতো না।

চাষী শ্রমিক আর দাসদের কিছু সুযোগ সুবিধে দিয়ে, তাদেরকে নিজেদের সামিল করে নিয়ে লড়াই করা তখন পর্যন্ত খুব দেখা যায়নি, অথচ কিছু করলে যে নিজেদের সুবিধে হবে সেটা সবাই বুঝেছে। সুযোগ সুবিধে যে সবটা আর্থিক তা নয়, কিছুটা আর্থিক হলেও অন্য একটা দিক আছে, সামাজিক ও মানবিক। তখনকার দিনের আর্থনীতিক ব্যবস্থায় এত বেশি কিছু তৈরি হত না যাতে সবাইকে আর্থিক সুবিধে দেওয়া যায়, চাষ বা পশুপালনে খরচা খরচ বাদ দিয়ে সায়গ্রাস বা অতিরিক্ত খুব বেশি থাকত না, সুবিধে আর্থিক না হয়ে অনেকটা সামাজিক ও মানবিক হওয়া স্বাভাবিক, সামাজিক স্বীকৃতি যেমন, ন্যায় বিচার প্রভৃতি। তাই তার ওপরে বেশি জোর পড়ল। তখনকার দিনে এগুলি ঠিক রাজার শাসনে হত না, ধর্মীয় শাসনেই হত, তাই নতুন শাসনব্যবস্থা নতুন ধর্ম গ্রহণ হয়ে দেখা যেতে লাগল। যে মহাপুরুষ সপ্তাহে একদিন কাজ বন্ধ রাখতে বলে, যে সুদের কারবার বন্ধ করতে বলে, যে দাসদের ওপর মানুষের মত ব্যবহার করতে বলে, দল আর জাত নির্বিশেষে সকলকে সমান চোখে দেখে, সবাইয়ের সঙ্গে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও সমান ভাবে মেলামেশা করে বা তাদের অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন করে তার দিকেই বেশি লোক আকৃষ্ট হতে শুরু করল। সভ্যতার ইতিহাস মানেই সমাজের এই অগ্রগতির ইতিহাস। যুগে যুগে সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে তার রূপও বদলে যাচ্ছে। যা একসময়ে খুবই বৈপ্লবিক মনে হত, তা কয়েকযুগ পরে সাধারণ অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি পেল, সেটা আর বৈপ্লবিক বা বিশেষ কিছু নয়, আরও বেশি কিছু চাই। একসময়ে যে প্রাণে না মেরে দাস বানাত সে অন্তত যারা মেরে ফেলত তাদের থেকে ভাল, আবার যারা বিজিতদের ওপর একটু ভাল ব্যবহার করত তাদের সামাজিক ব্যবস্থাকে বেশি অদল বদল না করে, আলাদা ভাবে সুযোগ দিত, সে আরোও বেশি প্রগ্রেসিভ মনে হল। যে পরাজিতের সঙ্গে সামাজিক বন্ধনে মিলিত হয়ে তাদেরকে বড় পদে রাখত সে আরও বেশী ন্যায়বিচারক, সে রাজা আরও বেশি কাম্য। তাই একসময়ে

যে সামাজিক ব্যবস্থা খুব আধুনিক বা বৈপ্লবিক বলে সম্মান পেত, তাই আবার কয়েক যুগ পরে অত্যাচার হিসেবে মনে হতে লাগল।

আর্থিক সুখ সুবিধে যে বিশেষ কিছু হত, তা নয়, বরং অনেক সময় কমই হত। রাজা যদি হেরে গিয়ে বশ্যতা স্বীকার করত, তখন প্রজাদের শুধু নিজের রাজা নয়, বিজয়ী মহারাজ বা সম্রাট বা শাহেন-শা যেই হোক না কেন তার জন্য বাড়তি ভেট পাঠাতে হত, সোনা-দানা, সৈন্য-সামন্ত রসদ, ঘোড়া, হাতী, সুন্দরী মেয়ে, বেগার খাটার জন্য শ্রমিক দাস সবই বোঝার ওপর শাকের আঁটি। অসুবিধে যাই হোক না কেন এড়িয়ে যাবার উপায় ছিল, তখন লোকজন অনেক কম, দেশের অনেকখানি জায়গা ফাঁকা, বনে জঙ্গলে ভর্তি, পাহাড়ে যাতায়াতের পথ নেই, অত্যাচারের মাত্রা বেশি হলে সুদূর জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে নতুন করে জমি হাসিল করে আবাদ করে বসতি আরম্ভ করল শত্রুর হাত থেকে অনেক দূরে আর দুর্গম জায়গায়। চোটটা বেশি পড়ত উর্বর সুজলা সুফলা জায়গার প্রজাদের ওপর। তারা তো বনে জঙ্গলে থাকতে অভ্যস্ত নয়। পালানোর উপায় নেই, পড়ে পড়ে মার খাওয়া ছাড়া পথ ছিল না। আবার এখনকার দিনের মত অত ভোগ্যবস্তুও তখন তৈরি হত না, যা দু চারটা হত তা অতি সযত্নে রাখা হত, ছেলে নাতিকে দিয়ে যাবার জন্য। এত খাবার দাবারও ছিল না, না পোষাক, না বাড়ি ঘর, যারা নেতা আর যারা প্রজা তাদের পোষাকে আসাকে খাবারে, তারা প্রায় সমান। তবে খাতির ছিল খুব, কার সামনে কি ভাবে যেতে হবে, কি ভাবে সম্মান দেখাতে হবে, কার সামনে ছাতা মাথায় দিয়ে চলা যাবে না, গাড়ি ঘোড়ায় চড়া যাবে না, তামাক খাওয়া যাবে না, সন্ত্রস্ত ভাবে থাকতে হবে, কত খানি নিচু হয়ে এগোতে হবে, কি ভাবে পেছোতে হবে এইসব ভব্যতা বা এটিকেট, সে একটা এলাহি কাণ্ড। কিন্তু যন্ত্র-সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে কলে শক্তি উৎপাদনের পর থেকে—মাস প্রোডাকশনের যুগে, যখন সকলের জন্য ভোগ্য বস্তু তৈরি করবার আশা দেখা গেল তখন আর্থিক সুখ সুবিধার কথা উঠল, আগেকার দিনের সামাজিক বা মানবিক কথাটার ওপর বা ধর্মীয় ব্যাপারের ওপর জোর কম পড়তে লাগল, আজকাল তো সেটা কোন ইস্যুই নয়। হিন্দু ও মুসলমান—জল ও পানির দিন আমরা পেরিয়ে এসেছি, ট্রামে বাসে ট্রেনে কে কোন্ জাতের, কে কি খাচ্ছে,

কে কি করছে, কে আমাকে দেখে সসম্মানে জায়গা ছেড়ে দিল না, এসব কথা কেউ বলেও না, ভাবেও না, আর্থিক ব্যাপারটাই মুখ্য। এই প্রসঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশ নিয়ে কিছু বলব।

শ্রমিকদের একজোট হয়ে আন্দোলনকে দেখা হত অনেকটা ষড়যন্ত্রের মত, কি কাজ করবে, কতক্ষণ কাজ করবে, তার বদলে কি পাবে সেটা ঠিক করার একমাত্র ন্যায়সঙ্গত মালিক হচ্ছে শিল্পপতিরা, সেখানে কিছু বলা মানে ওদের অধিকারে হাত দেওয়া। আইন কানুনও সেই মোতাবেক। নিজেরা যখন অতটা টাকা পয়সা ফেলে অতটা ঝুঁকি নিয়েছে, লাভই বল আর লোকসানই বল সেটা যখন একমাত্র নিজস্ব তখন সরকার বা শ্রমিক কি হিসেবে সেখানে মাথা গলাতে চায়? শাসক শ্রেণী আর শিল্পপতিরা প্রায়ই এক হওয়াতে বরং দেশের আইন, শিল্পের উন্নতি সেই সঙ্গে দেশের উন্নতির জন্য শ্রমিকস্বার্থ-বিরোধী আইন প্রণয়ন করতে ব্যস্ত। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতাতে সুবিধা করবার জন্য শ্রমিকের ওপর চাপ দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর কি? কোন শাসক, সভ্য দেশের আইন যে ষড়যন্ত্র সহ্য করবে এটা হতেই পারে না। সেই আন্দোলন অঙ্কুরে বিনাশ করতে না পারলে দেশ জঙ্গলে পরিণত হবে। তাই প্রথমে যখন মাইনে বাড়ানো দিয়ে আন্দোলন খুব জোরদার হোল তখন সরকার দর বেঁধে দিল, কোন শ্রমিক কত পাবে ইত্যাদি। তেমনি চাষের শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা যাতে অন্য শ্রমিকের মত হয় তার জন্য নানা জিনিষের দাম বেঁধে দেওয়া হল। এর কোনটাই ঠিক শ্রমজীবীদের স্বার্থে নয়, বরং ধনীদের সুবিধার জন্য, যাতে শ্রমজীবীরা না মানলে, আইন সেখানে তাদের বাধ্য করাতে পারে। লড়াইটা কত রক্তক্ষয়ী ছিল, কত স্বার্থত্যাগের পর, কত কষ্ট স্বীকারের পর আজ ট্রেড ইউনিয়ন এত শক্তিশালী হতে পেরেছে, সংগ্রামের সেই ইতিহাস প্রত্যেক শ্রমিককে আজও অনুপ্রাণিত করে। তাই যখন মালিকের ইচ্ছামত দিনে কাজের সময় ১২-১৪ ঘণ্টা বা উদয়াস্ত খাটার বদলে দিন আট ঘণ্টা কাজের সময় বেঁধে দেবার আন্দোলন আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে শিকাগো সহরে শুরু হয়, তারই স্মৃতি বহনের জন্য পয়লা-মে শ্রমিক দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে। ঐ দিন দেশে বিদেশে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক তাদের সংহতি জানাতে মাঠে ময়দানে সমবেত হচ্ছে।

ব্যাপারটা কি? পেট ভরে দু-মুঠো যারা খেতে চায় তাদের দাবিয়ে রাখার জন্য কেন এত প্রচেষ্টা? প্রজা বৎসল রাজা কেউ কি ছিল না, ন্যায় বিচার কি হোত না? ইতিহাসের পাতায় কি শুধু শুধু এই গুণ কীর্তন। এই শিল্পপতিরা কি সবাই অর্থলোলুপ আর তারা কি নানা ট্রাস্ট করে, শুধু নিজের দেশের জন্য নয়, সকল দেশের জন্য অগাধ সম্পত্তি দিয়ে যায়নি? আজও দিয়ে যাচ্ছে না? কোন শিল্পপতি কোন বুদ্ধিজীবী কি শ্রমিকের এই লড়াইয়ের সামিল হয়নি? এত যে শ্রমিক দরদী নেতা তারা কেন ক্ষমতায় এসে সব দিচ্ছে না, তারা কি সবাই ক্যাপিটেলিস্টের দালাল? তাদের বুলি কি ঘুম পাড়ানো আফিঙের বড়ি?

সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে কিছুটা ধারণার জন্য আমি একটা অ্যাক্টের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার কথা বলছি। বহুদিন আন্দোলনের পর সরকার দোকান কর্মচারীদের কথা ভেবে আইন প্রণয়ন করলেন যাতে সপ্তাহে কদিন ছুটি, কতক্ষণ পর্যন্ত দোকান খোলা রাখা যাবে, দৈনিক কত ঘণ্টা কাজ করতে হবে, কারা এর আওতায় আসবে বলা হয়েছে। দোকান কর্মচারীরা স্বাভাবিক ভাবেই কিছুটা খুশি, যা চেয়েছিল সবটা না হলেও কিছুটা তো হয়েছে। আমরা ক্রেতারা বরাবরই সকাল থেকে রাত দশটা পর্যন্ত দোকান খোলা দেখতে অভ্যস্ত, মাঝে দুপুরে কয়েক ঘণ্টা দোকান বন্ধ থাকত। বেশির ভাগ লোকেই অফিস-ফেরৎ ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে নিয়ে গিয়ে কেনাকাটা করত। যাদের সময় বা সুবিধে থাকত তারা সকালবেলা কেনাকাটা করত। বেশি কেনাবেচা হত ছুটির দিনগুলিতে। ক্রেতা সাধারণের এতে খুবই অসুবিধে। আবার ছোট ছোট দোকানগুলি এর আওতার বাইরে পড়ল, এদের অনেক দোকানে কর্মচারী নেই, মালিক নিজেই সব দেখাশুনা করে। দুপুরে নিজে গিয়ে বড়বাজার থেকে জিনিষ নিয়ে আসে। তাদের যদি দোকান খোলা থাকে তবে যাদের বন্ধ করতে হবে তাদের বিক্রি কমে যাবে, লোকসান হবে, এমনকি দোকান তুলে দিতে হতে পারে। বড় দোকানের এই অসুবিধের জন্য ঘোর আপত্তি, এর ফয়সালা না করে আইন চালু করা মানে ওদের ভাতে মারা। আবার ছোট দোকানিরা খুশি, তারা বড় দোকানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারছিল না। তাদের স্টক কম, আবার সরাসরি জিনিষ কেনবার লোক বা ক্ষমতা নেই, পড়তা বেশি, মহাজনের ওপর

অনেক কিছুর জন্য নির্ভরশীল। এখন ওরা কিছু সুবিধে করে নেবে। অনেকেই দোকানেই থাকে, আধখানা পাল্লা ভেজিয়ে কেনা বেচা করতে কোন অসুবিধে নেই, ওদের ওপর খবরদারি কে করবে? দোকান কর্ম-চারীদের স্বার্থে সামান্য একটি আইন অথচ অনেকের এতে আপত্তি এবং সঙ্গত কারণেই, কোন কিছু অমূলক নয়। ছোট দোকানিরা আইনে খুশি, কিন্তু দোকান বন্ধ করতে আপত্তি। এটা চালু করতে সরকারকে অনেক লোক নিয়োগ করতে হচ্ছে। বিদেশে গিয়ে আমাদের অবাক লাগত, রবিবার সব কিছু বন্ধ, পাঁচটার পরে কিছুই পাওয়া যায় না, অফিস থেকে ছুটি নিয়ে দোকানে যেতে হয়। দোকানে তাই পুরুষের থেকে মেয়েদের ভিড়। ওদেশের লোকেরা কিন্তু বেশ মেনে নিয়েছে, কেউই আইনের ফাঁকে কিছু সুবিধে করে নিচ্ছে না, আমাদের দেশের মত ফুটপাতে দোকান বসিয়ে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠও দেখাচ্ছে না। সকলে যদি মানতে রাজি না হয় তবে আইন চালু করতে অসুবিধে। সকলে যদি মানতে রাজি তবে ক্রেতারা ছাড়া কারো অসুবিধে হবার কথা নয়। তাও সাময়িক—যতদিন না তাদের কেনাকাটা করাটা দোকানের সময়ে মিলিয়ে নিতে পারছে। তবুও তো কোন্ দিন, বন্ধ রাখবে তার কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই, সাহেব পাড়ায় এক, অন্য জায়গায় সেখানকার সুবিধে মত। লোকদের কেনাকাটা তো করতেই হবে, যা রোজগার করে তার বেশি তো খরচ করতে পারে না, শুধু সারা দিন নিজের সুবিধে মত না করে দোকানির কিছুটা সুবিধে করে কেনা। দোকানিরা তীর্থের কাকের মত সারাদিন হা পিত্যেশ করে বসে থাকবে কেন? আমাদের যদি প্রয়োজন হয় সাপ্তাহিক ছুটির, আর বাঁধা সময়ের কাজ, ওদেরকে ওটা থেকে বঞ্চিত করার কি যুক্তি থাকতে পারে? ব্যাপারটা অনেকটা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে, দেশে বেকারের সংখ্যা এত বেশি, তাদের অভাবটা এতই জরুরি, এই ফাঁকে তারা কিছু বিক্রি করে নিজেদের বাঁচাতে চেষ্টা করছে, আর আমাদের অবস্থা এমন কিছু আহা মরি নয় যে আমরা কিছুটা সস্তায়—সস্তা কি না ঠিক বলতে পারব না—কিছুটা দরদস্তুর করে লাভ করার লোভ সামলাতে পারব, মুখে যতই কেন বলি না, হকার রাস্তা দখল করে চলাফেরার অসুবিধে করছে, 'ফুটপথটা কার পথ-চারীদের না হকারের,' 'বাইরের সব লোক এসে ফুটপাত বেদখল করছে''

ইত্যাদি ইত্যাদি, সেই আমারাই অফিস পাড়ায় ফুটপাতে দাঁড়িয়ে টিফিন সারছি, ছেলে মেয়েদের জন্ম জামা, আর অফিস ফেরৎ যাবার পথে শিয়ালদহের রাস্তা থেকে সরাসরি মেয়েদের কাছ থেকে কিছু সস্তায় সওদা কিনতে বেশি আগ্রহী। আমাদের যদি এই লোভটুকু থাকে তবে দোকানিকে ঝাঁপ বন্ধ করে ফুটপাথে বসা ছাড়া উপায় কি? সুপার মার্কেটে যত না ভীড় তার বেশি ভিড় বাইরে, এই অবস্থায় কে সেলামি আর ভাড়া দিয়ে ঘর নেবে, কেইবা টাকা খরচ করে দোকান ঘর করবে? সব কিছু দেশের অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে আস্তে আস্তে হবে, সেটা মেনে নিয়ে আমাদের এগোতে হবে, এছাড়া আর উপায় বা কি?

শিল্পের ক্ষেত্রে বাধা অনেক বেশি, খদ্দেরদের বেলায় তারা তো কেনাকাটার জন্ম কাছে-পিঠেই যাবে, দুরে গিয়ে কেনাকাটা করবে না, করলেও দুএকদিনের জন্ম, তার পরে গাঁই গুঁই করলেও মেনে নেবে। শিল্পপতিরা খুবই একা চলার পক্ষপাতী—কার্টেল আর মনোপলি তখনও দেখা দেয়নি—নিজেদের মধ্যে গলাকাটা প্রতিযোগিতা, যে-কোন বাজারে যে-কোন দেশে তারা তৈরি জিনিষ পাঠাতে পারে, কোথায় তৈরি আর কি ভাবে তৈরি তা নিয়ে ক্রেতারা মাথা ঘামায়না, সস্তায় যেটা ভাল, পছন্দ মত, সেটাই কিনবে, শিল্পপতিরা অন্যের বাজার দখল করে, আধিপত্য বিস্তার করতে উন্মুখ। এই অবস্থার কোন শিল্পই, যারা একই বাজারে বিক্রি করে, তারা ইচ্ছা থাকলেও লোকজনকে অন্যদের থেকে বেশি সুযোগ সুবিধা, বেশি মাইনে দিয়ে তৈরি খরচ বাড়াতে পারে না, তাই কোন এক শিল্পে যদি শ্রমিক আন্দোলন হয়, তবে লড়াইটা অনেকদিন চলবে, কেউই তো ইচ্ছা করে নিজের ব্যবসা ডুবোবে না। আবার শ্রমিকরা চাকরি খুইয়ে, শিল্প বন্ধ হয়ে গেলে যা হবে—সেটা বন্ধ হয়ে যাক তা চাইতে পারে না। তা ইউনিয়ন যতই বলুক না কেন তাতে রাজি নয়। শিল্প এবং শ্রমিক সবাই দোটানায় পড়েছে, শিল্পপতিরা এই অন্যায় স্ট্রাইক ভাঙতে, শ্রমিকদের উস্কানির হাত থেকে বাঁচাতে, কিছুটা কাণ্ডজ্ঞান এনে দিতে সব রকমের চেষ্টা করতে লাগল, তারা যা করছে তা দেশের ও দশের ভালর জন্যই করছে এই বিশ্বাসে তারা অটুট। আবার ইউনিয়ন লিডারদের অবস্থা আরো কাহিল, এতখানি যোগাড় যন্ত্র এত ব্যবস্থা করে, এতদিন কষ্ট স্বীকার করে শ্রমিকরা যে লড়াই চালাচ্ছে তা থেকে

পেছোয় কি করে, তাদের তো দেশ ছেড়ে পালাতে হবে ; ওদের বিরোধী নেতারা সুযোগ খুঁজছে ওদের তাড়িয়ে দিতে, তাই তারাও ছাড়তে পারে না। কাউকেও কাজে যেতে দেবে না। বড় বড় পিকেট লাইন, দরকার হলে মারপিট করতেও পেছপা নয়—শ্রমিকরা যদি নিজের স্বার্থ না বুঝতে পারে এতটুকু আঘাতেই ভেঙ্গে পড়ে, লড়াই থামিয়ে বশ্যতা স্বীকার করে তবে শ্রমিকের দুর্দশা তো কোনদিন যাবে না। 'এ লড়াই বাঁচার লড়াই'। কাকে আপনি কি বলবেন ? কাকে আপনি দোষ দেবেন ? ব্যাপারটা যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল তখন দুটি উপায়, সব কারখানাতে একযোগে স্ট্রাইক, যাতে কোন শিল্পপতি এর অন্যায় সুযোগ না নিতে পারে, শিল্পপতিরা যাতে সহজে ওদের দাবিদাওয়া মেনে আপোষ করতে পারে। বলাটা সোজা করাটা অত সোজা নয়, প্রত্যেক ইউনিয়ন লিডার প্রায় খুদে ডিক্টেটর্, তারা কিছুতেই মিলতে পারছে না, একে অন্যের প্রাধান্য সহ্য করতে পারছে না, তবুও নিজেদের তাগিদে কয়েকটা ইস্যুতে একসাথে এককাজে সামিল হবার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগল। আর একটা হল, শিল্পপতিরা যখন দেখছে শ্রমিকরা কিছুতেই মানতে রাজি নয়—শিল্প সব উঠে যাবার, বন্ধ হবার অবস্থা তখন নিজেরাই এক হবার চেষ্টা করল, কেউ এর অন্যায় সুযোগ নেবে না, এক শিল্প যদি মাইনে বাড়ায় তখন সেই রকমের সব শিল্পই মাইনে বাড়াবে, তাদের কারখানায় স্ট্রাইক হোক বা না হোক। লড়াইয়ের স্থিতাবস্থার কিছুটা সুরাহা হবার আশা দেখা দিল। স্ট্রাইক শুরু হল লীডার অব দ্য ইণ্ডাস্ট্রির কারখানায়—যেটা বড় সেখানে, তাতে যা ফয়সালা হত তা অন্য সকলে মেনে নিতে লাগল। অন্য শিল্পপতিরা নিজেদের মধ্যে যে বড় তাকে না মেনে ব্যাবসা করার কথা ভাবতেই পারে না। যারা নানা কারণে অতটা সুযোগ সুবিধে দিতে অপারক তাদের সরে যাওয়া ছাড়া উপায় রইল না। কিছু কিছু কারখানা বন্ধও হল। কিন্তু সব মিলিয়ে শ্রমিকরা কিছুটা সুবিধে নিল, শিল্পে শান্তি, আর সবাই যখন একসাথে, খরচা যা বেশি পড়বে তা ক্রেতাকে দিতে হবে—যতই কেন বলি না ওদের লাভের অংশ কেটে বাড়তি সুযোগ সুবিধে আসবে। তা বলে সবটাই যে ক্রেতার ঘাড়ে চাপবে তা নয়, ওদের প্রতিযোগিতা শুধু নিজের স্টেটে বা নিজের দেশে সীমাবদ্ধ নয়, কলকাতার শিল্পে যদি মাইনে বাড়ে, খরচ বেশি হয় তার সুযোগ

মাদ্রাজ কানপুর নেবেই, তারা কম দামে মাল পাঠিয়ে বাজার নিয়ে নেবে, কলকাতার শিল্প বন্ধ হবে। চাকরিই যদি যায় তার মাইনে বেশি আর কম, তাতে শ্রমিকের কি আসে যায়, বড় বড় কারখানা না হয় কোন রকমে টিকে থাকবে, তাদের শ্রমিকরা সুখ সুবিধে ভোগ করবে, যার চাকরি গেল সে কি করবে? চুলোয় যাক সুযোগ সুবিধে আজকে তো বাঁচতে হবে, তার কাছে আগেকার মালিক অনেক ভাল লোক ছিল, অন্তত কিছুটা তো দিত, আর আজ মালিক আর শ্রমিক দুজনাই বেকার, সে ক্ষেত্রে আইন যা বলে বলুক কাগজে কলমে যে মাইনে লিখতে হয় লিখুন—দাবি দাওয়া যাই থাক তা সরকারি আর বড় শিল্পের জন্যই তোলা থাক আপনি বরঞ্চ যা দিচ্ছিলেন তাই দিয়ে বা যা দিলে পোষায় তাই দিয়ে কারখানা চালু করুন। সব ক্ষুদ্র শিল্পে এই অবস্থা, মাইনে কম পেলেও, ওদের কাজে ফাঁকি নেই, সিঙ্গল রেটে ওভারটাইম করছে, মালিক, সে ওদেরই একজন, খুবই সদ্ভাব, সেই তো অন্নদাতা। আমাদের ক্লাস স্ট্রাগল সেখানে পাত্তা পায় না। বড় বড় কারখানা সাধারণ কাজে এদের সঙ্গে দামে পারে না, তাদেরও নাভিশ্বাসের যোগাড়। শুধু সরকারি শ্রমিকরাই এর ফায়দা ওঠাতে পারছে, সরকারের তো টাকার অভাব নেই, তাদের তো তারা কি ভাবে চালাচ্ছে তার জবাবদেহি করতে হয় না। তবে কাগজে কলমে লেখালেখির জন্য একটু চক্ষুলজ্জা হয়, সেই ঢাকা বা চাপা দেবার জন্য সব শিল্প জাতীয়করণ করতে হবে, সব রকম ট্রান্সপোর্ট সরকারি আওতায় আনতে হবে বলে অন্যদের বুঝ দেবার চেষ্টা। অন্যদিকে শ্রমিকদের রক্তচুষে শিল্পপতিরা কেমন ফুলে ফেঁপে উঠেছে—তারা যে সব নষ্টের মূল—সাম্যবাদের যুগে তাদের থাকার অধিকার নেই—এই মহান সত্যটা তারস্বরে প্রচার করছে, শুধু চেপে যাচ্ছে কাজ না করে কারো খাবার অধিকার নেই, এই কথাটা।

এক দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা এই হাল করেছে, তার সঙ্গে যদি বিদেশী প্রতিযোগিতা আসে, যাদের যন্ত্রপাতি অতি আধুনিক, প্রায়ই অটোমেটিক (স্বয়ংক্রিয়), যাদের প্রয়োগবিদ্যা অতি উচ্চ ধরনের, তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবে কি ভাবে। এই অবস্থার সরকার নানা রকমের ট্র্যাফিক ওয়াল তৈরি করে দেশের শিল্পকে বাঁচাতে পারে, তাই এত ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট ডিউটি আর একে ফাঁকি দিয়ে স্মাগলারদের বাড়-বাড়ন্ত। এই গোলক ধাঁধাঁর হাত থেকে

বাঁচতে হলে, শিল্পকে বাঁচাতে হলে, শ্রমিককে মানুষের মত বাঁচবার অধিকার দিতে হলে, প্রয়োগবিদ্যা আধুনিক করতেই হবে, সকলকেই সমান ভাবে খাটতে হবে, কি মালিক, কি বুদ্ধিজীবী, কি শ্রমিক সকলকেই একসাথে, আবার আজকে কোমর কষে আধুনিকীকরণের টাকা জোটাতে হবে।

লড়াইটা কেন এত দীর্ঘস্থায়ী হয় তার একটা ধারণা দেবার জন্য কথা-গুলোর আলোচনা করলাম। আমাদের সকলের ক্ষমতা সীমিত, এই সীমিত ক্ষমতায় যা করা যায় তার বেশি তো কেউই করতে পারবে না, যতই কেন ইচ্ছা থাকুক। তবে সবাই যদি অবুঝ হয়, আমারটা দেখ আমারটা দেখ বলে চেঁচাতে থাকে তখন আলতু-ফালতু কথা বলা আর স্তোকবাক্য দেওয়া ছাড়া উপায় কি। অথচ এই অবস্থা কেউই চায় না, শ্রমিক চাষী দুবেলা দুমুঠো খেতে পারবে না, তাদের খোঁয়াড়ের মধ্যে বাস করতে হবে, আজ আর কেউ বলে না, তাদের শিক্ষা দিতে কারো আপত্তি নেই, আপত্তি নেই তাদের চিকিৎসার জন্য সব কিছু করতে, বুঝতে পারছে দেশের বেশির ভাগ লোককে বাদ দিয়ে উন্নত ও শক্তিশালী দেশ গড়া যায় না।

"যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥"

মিলে মিশে কাজ

আমাদের সুন্দর জীবনের চাবি কাঠির একটা হচ্ছে, বেশি করে ভোগ্য দ্রব্য তৈরি করা। যে জিনিষ হয়নি বা কম হয়েছে, আদপেই হয়নি তার ভাগ বাঁটোয়ারার কথা ওঠে না। এই প্রোডাকশনের জন্য চাই—মূলধন, প্রযুক্তি-বিদ্যা, কাঁচামাল, আর শ্রম। প্রথম তিনটে নৈর্ব্যক্তিক তাদের কোন নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা নেই, টাকা যে ভাবেই পাই না কেন যার হাতেই থাকুক না কেন টাকাই। কিন্তু মানুষ যে এসবের যোগসূত্র তার একটা আলাদা সত্তা আছে, তার ইচ্ছে অনিচ্ছা আছে, আমাদের সব কিছুর সাফল্য শেষ পর্যন্ত

মানুষের ওপরেই নির্ভর করে। টাকা থাকলে সব ভাল ভাল আধুনিক যন্ত্রপাতি কেনা যায়, কিন্তু তা চালাবার উপযুক্ত প্রযুক্তি শিক্ষা বা বিদ্যা না থাকলে কোন কিছুই কাজে লাগবে না। সেটা মানুষকেই করতে হবে, শ্রমও মানুষকেই করতে হবে। মানুষ তো একজন নয় অনেক, তাদের প্রত্যেকের মন আলাদা, মত আলাদা, তাদের সকলকে একসাথে একযোগে একমনে কাজ করাতে পারলে তবেই প্রোডাকশন বাড়বে, যেহেতু শেষ পর্যন্ত মানুষের ওপরে সবকিছু নির্ভর করছে, তাই আজকাল ওদের মতিগতির ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। আগের দিনে অতটা দিতে হত না, কারণ তখন অনেক জোর খাটানো যেত, এখন সকলে সংঘবদ্ধ, শ্রমিক তার শ্রমের দাম বুঝতে শিখেছে, একজোট হয়ে দাবি আদায় করতে জানে, কথায় কথায় আজ তাদের খারিজ করা যাবে না, ভোটের জোরে শাসন ক্ষমতা ওদের করায়ত্ব হতে চলেছে, সব পার্টিকে আজ তাদের দ্বারস্থ হতে হয়। বুদ্ধিজীবীরা বরাবরই একরোখা, কারও মাতব্বরি সহ্য করে না, নিজেদের ওপর অগাধ বিশ্বাস, নিজেদের গুণে যেখানে যাবে সেখানেই চাকরি পাবে, তাদের কদর সর্বত্র, দেশের থেকে বেশি সর্বদেশীয় ভাব, কোথাও যেতে আপত্তি নেই। এক সময়ে শ্রমিকদের মত সংঘবদ্ধ হওয়াতে, স্ট্রাইক দাবি দাওয়া নিয়ে পথে নামতে তারা কিন্তু কিন্তু করত, কিছুটা লজ্জা পেত, আজ আর সেদিন নেই, ওরাও দাবি আদায়ের জন্য কোন কিছু করতে পেছুপা নয়। সব থেকে বদলে গেছে শিল্পপতিরা, এক সময়ে দেশ বলতে ওদেরকে বোঝাত, ওরাই ছিল দেশের হর্তা-কর্তা বিধাতা। দেশের সম্পদ তো ওদের হাতে, শিল্প ওরাই গড়েছে নিজেদের টাকায়, চেষ্টায়, অনেক টাকার ঝুঁকি নিয়ে। আজ আর তাদের সেই ক্ষমতা নেই, তাদের সব গুণ স্বার্থসিদ্ধির ফিকির ছাড়া অন্যকিছু বলে সাধারণে মনে করে না, শাসন ক্ষমতা ওদের হাত থেকে চলে গেছে, ওদের দোষগুলি খুব বড় করে দেখানো হচ্ছে—ওরা সবাই আজ জনগণের বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু বলে বলে চিহ্নিত হচ্ছে, ওদের হাত থেকে সব শিল্প, সব সম্পদ, যা অনেক কষ্টে ওরা করেছিল তা জোর করে বা নামমাত্র মূল্যে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। ওরা মনে করে ওদের অবদান আর কারো থেকে কম নয়, শিল্প গড়ে তোলার যে দক্ষতা ওদের আছে, তার কোন মূল্যায়ন হচ্ছে না। এই অবস্থায় নিজের দেশ নিজের শিল্প এ কথাটা মনে না আসাই স্বাভাবিক। ওরা যে

শিল্প সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল তা বুরোক্র্যাটদের হাতে পরে ডুবে যাচ্ছে। ওদের সেই মোহ কেটে যাচ্ছে যার জন্য ওরা আপ্রাণ খেটে সব গড়েছিল। নিজের টাকাটা, নিজের ভালটা বুঝতে শিখেছে, একটা কিছু গড়ব সেই মনোভাব নেই বরং টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে নিঝ্ঝাটে পায়ের ওপর পা রেখে খাব। ওরা আনকোরা লোকদের—যারা লম্বা লম্বা কথা বলত তাদের, দৌড় দেখতে চুপ করে বসে আছে। নিজের টাকার ঝুঁকি নেবে না, সরকারি টাকায় ব্যবসা আর শিল্প গড়ে তুলতে যদি সরকার চায়, যদি শাসক শক্তি ওদের গুণের কদর বুঝে ওদের ডাকে, তবুও আগের দিনের মত নিজের মত ভাবতে পারে না, কারণ জানে যে সরকারের কাছে সফল অর্থনীতি যত দরকারি হোক না কেন তার থেকে বেশি দরকার ভোটে জেতা, তার জন্য শেষমেষ ওরা ভোটারের বা জনসাধারণের মুখ চেয়ে সাময়িক স্বার্থে নীতি নির্ধারণ করবে, এর মধ্যে আর অপ্রিয় সত্যি কথা বলে কি লাভ? বরং সব ভুলে ওদের কথায় তাল দিলে নিজের চাকরিও বজায় থাকবে আর নিজের আখের গুছোতে সুবিধে হবে। এত বিভিন্ন অথচ দরকারি লোকদের কি ভাবে সমন্বয় ঘটিয়ে দেশকে উন্নতির পথে নেওয়া যায়? তাই মানুষের প্রকৃতি, ভাবধারা, ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল ধরে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে।

মানুষের ব্যবহারের আর ভাবনার মূলে আছে—ফিলিং আর ইমোশন। একজনের প্রতি আর একজনের ফিলিংস না থাকলে রাগ বা পছন্দ-অপছন্দের কথা বা বাধাদানের কথা ওঠে না। আবার এটা না থাকলে জীবনে উন্নতি, সার্থকতার কোন মানে হয় না। এই পৃথিবীর সব কিছুই সে তার ফিলিংস আর ইমোশনের আলোকে দেখে যাচাই করে। লোকে কোন্ বিষয়ে কি ফিল করে বুঝতে পারলে, আমরা তার ব্যাবহারও বুঝতে পারব —সে কি করবে না করবে তারও একটা ধারণা করতে পারব এবং ব্যাপারটা বুঝে পরের কি করণীয় তাও ঠিক করতে পারব। কিন্তু সভ্যতা আমাদের শিখিয়েছে মনের ভাব না প্রকাশ করতে, বিশেষ করে যেগুলি আনন্দদায়ক নয়, "আমরা ঘুরারে মাথা দাঁতের আগে মিষ্ট হাসি টানি ভদ্রতার বাণী" বলতেই অভ্যস্ত, আবার আমরা নিজেদের ভাবে এত মশগুল হয়ে থাকি, অন্যদের ছোটখাট আচার বা ব্যবহার যা মনের ভাব প্রকাশ, ভাবের ইঙ্গিত দিতে পারে সেটা দেখার ফুরসুৎ পাই না। অনেক সময় আমরা বসের

সামান্য হাসি মুখের নানা রকমের ব্যাখ্যা করলেও অন্যদের বেলায় তাদের মনের ভাবের তোয়াক্কাই করি না, এবং তা করার দরকারও মনে করি না। শিল্প ক্ষেত্রে আমাদের ধারণা 'ভাবাবেগের কোন জায়গা নেই', সেখানে সকলকে 'প্র্যাকটিক্যাল যুক্তিপূর্ণ হওয়া চাই চাইই'। অথচ এই অনুভব শক্তি একজনের প্রতি আরেক জনের সম্পর্ক কি হবে তা ঠিক করে। মানুষ চায় আত্মসন্তুষ্টি, ব্যর্থতার থেকে মুক্তি, নিজেদের মধ্যে বোঝাবুঝি, দরকারের সময় সাহায্য, নিজেকে জানতে এবং শান্তি। যাকে আমরা নীরবে কাজ করতে দেখি, যে সাত চড়েও কথা বলে না, সেও মনে মনে অনুভব করে, কিছু পেতে চায়, অনেক কিছু ভাবে, অন্যের সম্বন্ধে ধারণা করে নেয়, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে চায়, নিজেকে প্রকাশ করতে চায় এবং ওর বুদ্ধিতে যত দূর কুলোয় সেইভাবে সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে চায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার একটা বিশিষ্ট চালচলন হয়, আর তার ধরনে ধারনে কথায় বার্তায় কাজে কর্মে তাই ফুটে ওঠে। লোকজনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে শেখে, নিজের সম্বন্ধে ওর একটা ধারণা গড়ে ওঠে, নিজের মনের মত লোকদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করে, তারা জীবনের ধারা প্রায় ঠিক করে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে সে কতকগুলি বিশ্বাস করতে শেখে, ভাবপ্রবণ হয়। চারপাশের যা কিছু ঘটছে তার সম্বন্ধে একটা মূল্যায়ন করে নেয়, কোন্‌টা ভাল মন্দ, কোনটা করা উচিত নয় সেটাও ঠিক করে। যে যে-সমাজে বাস করে বা কাজ করে তার মধ্যেই সে খুঁজে নিতে চায়, চায় তার সন্তুষ্টি, নিরাপত্তা, সুখ সুবিধে, উন্নতি আর মনের বিকাশ। মানুষ সবসময়ে এর সন্ধানে ঘুরছে, আর যেহেতু চাকরি থেকে এসব আসে তাই সে সেখানকার সব বিষয়ে সজাগ। সব কিছু বুঝিয়ে না বলেল সেও যে ভালো মন্দ বুঝতে পারে। তার স্বীকৃতি না দিয়ে, তাকে তার কর্মক্ষমতা প্রমাণ করবার সুযোগ না দিয়ে এটা কর ওটা কর, হুকুম মত চল—তা সেটা যত ভালই হোক না কেন তার সম্বন্ধে বিতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। যে প্রমোশনটা ওর প্রাপ্য ছিল বলে ধারণা সেটা না পেলে তার ওপর যে অবিচার করা হয়েছে সেটাই সকলকে বোঝাতে চায়, তার রাগ বা অভিমান সবটা মালিকের ওপর, কারণ তার সব কিছুই তো পার্থিব সুখ চাকরির সঙ্গে বাঁধা। অপমানের জ্বালা বড়ই জ্বালা তা সহজে হজম করা যায় না, সকলের সামনে তাকে মুখ রক্ষা করতেই হবে

তা সে যেমন করে থাকুক। নিজের মান ইজ্জৎ খুইয়ে সে বাঁচতে চায় না। মানুষ আবার বড়ই গতানুগতিক ভাবে চলতে চায়, তাতে যদি সে নাম করে থাকে, জীবনে সার্থক হয়ে থাকে, তাহলে তো আর কথাই নেই, তবে সে কিছুতেই পথ বা মত পালটাতে চায় না। তার সেই মত পালটাতে হলে, নতুন আলোকে নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অনেক ধৈর্য আর চেষ্টা করে তার বিরোধিতা করার মনোভাব কমাতে হবে, তখন সামান্য চেষ্টাতে সামান্য জোর খাটিয়ে তাকে দলে টানা যাবে। তা না করে যদি সরাসরি জোর খাটানো হয় তার ফল হবে খুবই সাময়িক। এটা কিন্তু একবারও মনে ভাববেন না যে, সবাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শুধু "বাণী কৌশলে জিনিবে ধরণীতলে", কিছু পূজাও দিতে হবে, কিছু ঘুশ। মানুষের মধ্যে সদ্‌গুণ যেমন আছে বদগুণও তেমনি আছে, সৎ বা অসৎ কোন্‌টা তা অত সহজে বলা যায় না, ওটা প্রায় কূটতর্কের আর ন্যায় বিচারের মধ্যে পড়ে। এর সবটাই তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে পড়ে। আত্মীয় স্বজনকে দেখা যেটা একটা সামাজিক গুণের মধ্যে পরে, তাই যদি চাকরির ক্ষেত্রে কেউ করতে চায় তবে আত্মীয়-পোষণের দায়ে পড়বে। নিজের দেশকে বা জাতকে ভালবাসা খুবই ভাল বলে মনে হতে পারে, আবার সেটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে প্রাদেশিকতার দায়ে পড়বেন, দেশ ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে যাবে। যুদ্ধের সময় সব কিছু বাজি রেখে পরস্পরের বিরুদ্ধে যে বিষ ছড়ানো হয়, তা যদি শান্তির সময় আমাদের মন থেকে মুছে না যায় তবে, আজকালকার বহুজাতিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠতে পারে না। চুরি করা অন্যায় অথচ এক সময়ে গরু-চুরি মেয়েচুরি ছিল একটা খেলা, বিজয়ীর তোফা। যে বাবা মা ছোট বেলা থেকে সন্তানের জন্য সব কিছু করেছে, সন্তান বড় হলে তাই যদি করতে চায়, তার কি করা না করা উচিত বলতে যায়, তবে ছেলের বউ বা জামাইয়ের সঙ্গে মন কষাকষি হতে বাধ্য। মানুষের মুখের কথা তার মনের কথা এক ভাবে প্রকাশ করা হয় না, আমরা কি শুধু মুখের কথাই শুনব, অন্তরের কথা কি আমরা জানতে চাইব না? আমরা কি একসাথে হাতে-হাত মিলিয়ে উন্নতির পথে এগোতে পারব না?

সভ্যতার ইতিহাস দেখলে আমরা গায়ের জোর আর বুদ্ধি বিবেচনার ও বোঝানোর জোরের মধ্যে তুলনা করি তবে দেখতে পাব মানুষ অন্তরের সঙ্গে

যা মেনে নেয়, যা সে ভাল মনে করে তা কতদিন টেকে কত শতাব্দী পরেও তার উজ্জ্বলতা কমে না। ধর্মের জয়জয়াকার পশু শক্তি থেকে অনেক গুণ বেশি, অনেক গুণ স্থায়ী। তাই বলব মানুষকে সম্মান দিন, তাকে বুঝতে শিখুন, বোঝাতে শিখুন, তবে অনেক সহজেই অনেক কিছুর ফয়সালা হয়ে যাবে। সার্থক ম্যানাজার আর রাজনীতিবিদদের এই বোঝানোর ক্ষমতাই সবচেয়ে বড় গুণ।

উদ্যোগ ও পরিকল্পনা

আপনি নিশ্চয় রেলওয়ে টাইম টেবল দেখেছেন, যাতে কোন্ লাইনে পর পর কোন্ ট্রেন যাবে তা পাশাপাশি লেখা আছে। প্রতি লাইনের প্রথমে আছে ট্রেন নম্বর, সেটা স্টেশনের কত নম্বর প্লাটফরম থেকে, কটার সময় ছাড়বে তা দেওয়া আছে। তারপর নীচের দিকে নেমে যান দেখবেন পরের স্টেশন কি, সেখানে থামবে কি থামবে না, থামলে কটার সময় পৌছবে, কতক্ষণ থামবে এইভাবে শেষ স্টেশন পর্যন্ত। আমরা এইটা দেখে আমাদের যাতায়াতের সময় ঠিক করি। এটাই মূল সিডিউল বা তালিকা। এইটা দেখে লোকো শেডে ট্রেন ঠিক করে রাখা হয়, দরকার মত বগী দিয়ে, সেগুলি আবার নম্বর দেওয়া, যাতে রিজার্ভেসন চার্ট দেখে আপনি আপনার সিট সহজেই খুঁজে পান, যে বগীটা আগে কেটে রাখা হবে সেটা সবার পেছনে থাকে। তাই দেখে আবার যিনি 'ম্যান' করেন বা লোকজনের কাজ ভাগ করে দেন, তিনি ঠিক করেন কে সেটা চালিয়ে নিয়ে যাবে, কে গার্ড থাকবে ইত্যাদি। টাইম টেবল হচ্ছে মাস্টার প্ল্যান যা দেখে প্রত্যেক সেকসেন প্রতি স্টেশনে প্রতিটি লোক কি করতে হবে তার একটা ছক কেটে নিতে পারে। ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে এসবগুলিকে চালু করা ও ভাল ভাবে চালু রাখা, তার জন্য আছে বিরাট কণ্ট্রোল রুম। সেখানে মুহূর্তে মুহূর্তে খবর আসছে কোথায় কি হচ্ছে, সামনের রেল লাইনের নক্শা পাতা আছে তাতে নানা রকমের কায়দায় কোথায় কি হচ্ছে তা চোখের সামনে তুলে ধরার ব্যবস্থা। আর তাই দেখে কণ্ট্রোল রুম থেকে অর্ডার যাচ্ছে কখন কি করতে হবে। ভুলভ্রান্তি যাতে কম হয়, সেইজন্য সব ইন্টারলক করা,

যাতে আগেরটা ঠিক না হলে যেন পরেরটা না হয়। ঠিক সময়ে ট্রেন ছাড়লে ও পৌঁছলে আমরা ধরে নেব সব ভাল চলছে।

কিন্তু এর আগেও অনেক কাজ হয়ে আছে, রেল লাইন, স্টেশন, লোকজন, কারখানা সবকিছু। তার উপর তো আজকে যে কাজ করছে তার কোন হাত নেই। রাস্তা আর বাস হবার পরে কেউ যদি ট্রেনে চড়ে দার্জিলিং না যায়, তবে ও লাইনের লোক তাদের কাজ দেখাবে কি করে, আবার টাকার দিকে দেখলে এটা লোকসানের কারবার, লোকগুলিকে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেওয়া। এতে ঐ লোকজনের কি কতটুকু করবার আছে?

শিল্প ক্ষেত্রে উদ্যোগের মূল্য অনেক বেশি, প্রথমে উদ্যোক্তাকে ঠিক করতে হবে কি তৈরি করবেন, জিনিষটা কি মানের হবে, কতটা তৈরি করবেন। সেটা নিজের খুশিমত করলে চলবে না, বাজারে খুঁজে খবর নিতে হবে, যাকে আমরা বলি মার্কেট সার্ভে। স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরেও আমরা যদি স্বদেশী যুগের কথা মনে করে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে" বলে সত্যিই মোটা কাপড় তৈরি করি, তার কাটতি হবে না, তা সে যত কম দামই হোক না কেন, গুদামে পচবে, শেষমেষ লোকসান দিয়ে ঘাড় থেকে নামাতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে মিলও বন্ধ। এর পরের ধাপ হচ্ছে টেকনোলজি বা প্রয়োগবিদ্যা। কি ভাবে তা করতে হবে, নিজে করে করে ঠেকে কাজ করবেন—সকলে তো আর একলব্য নয় গুরুর ধ্যান করেই সব শিখে যাবে—না, কোন অভিজ্ঞ লোক বা সংস্থা, যে এই কাজটা সাফল্যের সঙ্গে করেছে তার সাহায্য নেবেন—গুরু হিসেবে মেনে সাকরেদি করবেন? আপনার নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস থাকলেও অন্যদের আপনার ওপর সেই বিশ্বাস থাকা চাই। এটাকে বলা হয় 'নো হাউ'। এরাই ঠিক করে দেবে কি কি মেশিন কিনতে হবে, কোথায় প্লেট বসালে সুবিধে হবে, কি রকম বিল্ডিং হবে, কি রকমের লে আউট, কত জন লোক লাগবে, কি রকমের লোক, তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে কাজের উপযুক্ত করবে, প্লেটকে চালু করে, ফুল প্রোডাকসনে নিয়ে আসা ইত্যাদি। এখানে অনেক রকমের স্বার্থ খুবই সক্রিয় হয়ে ওঠে। সব স্টেট চাইবে আমার এখানেই হোক, সরকার চাইবে তার কারখানাতে যেন মেশিনপত্তরের অর্ডার হয়, কেউ এই ফাঁকে বিদেশে ঘুরে কিছুটা কমিশন বাগাবার তালে থাকে, অহেতুক বেশি দামি মেশিন কেনে—

সেলসম্যানের পাল্লায় পড়ে,—কেউ বা আবার কারখানা সবচেয়ে ভাল মেসিনে সাজাতে উৎসুক, তার কাজ থাকুক আর নাই থাকুক,—অনেক সময় স্রেফ টাকার শ্রাদ্ধ। লোকজন নেবার সময় সেটা চরমে ওঠে, সকলেই নিজের লোকদের চাকরি দিতে ব্যস্ত, প্রোমোটার চায় নিজের লোক নিতে লোক্যেল লোক আছে, যে পারছে, সেই তার লোক ঢোকাতে ব্যস্ত, তাই যেখানে কঠোর হাতে এটা বন্ধ করবার দরকার কেউ মনে করে না, সেখানে যা দরকার তার দু তিন গুণ লোক ঢোকানো হয়। কাজের দরকারে, আর লোকের গুণ ধরে লোক নেবার কথা নিয়ে সার্থক শিল্পপতি, উঁচু দরের নেতা ছাড়া কেউই বড় একটা মাথা ঘামায় না। অনেক সময় দেখা যায় বড় বড় পোস্টধারী অনেকেই আত্মীয়ের জোরে পোস্ট পেয়েছেন। এজন্য তারাও তাদের মেণ্টরকে খুশি করাই নিজেদের ধ্যান জ্ঞান করে নিয়েছে। গোড়াতেই যদি টাকা বেশি খরচ হয়ে যায়, বেশি লোক নেওয়া হয় তবে আর্থিক সাফল্য আশা করা যায় না। তাদের বিচার করতে গেলে ফালতু লোকের জন্য কিছুটা ভরতুকি দিতেই হবে। এটা যে নতুন উদ্যোগের বেলায় সত্যি তা নয়, অনেক রুগ্ন সংস্থা, যাদের ঘাড়ে বিরাট ঋণের বোঝা চেপে আছে নানা কারণে, যার জন্য আজকে ওয়ার্কার মোটেই দায়ী নয়, যে টাকার তুলনায় অ্যাসেট খুবই কম, তাদের থেকে বোঝা কমিয়ে না দিলে নিজের পায়ে দাঁড়াবার আশা অনেকটা দুরাশা হবে। এর ফলে সকলেই কি ম্যানেজমেন্ট কি শ্রমিক, কি সরকার সবাই খুব হতাশায় ভোগে। লোকসানটা লোকসান না ভেবে, যা হবার হয়ে গেছে, নতুন করে হিসাব নিকাশ না করে, যদি লোকসান আর তার সুদের জের টানতে হয়, হতাশা আসতে বাধ্য; তবে হতাশার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য, উৎসাহ দেবার জন্য, কেন এটা করা হয় না? হয় না তার একটা বড় কারণ বেশির ভাগ টাকাই তো ব্যাঙ্কের, তাদের হিসাবের খাতাতে টাকাটাকে পাওনা ধরে, সুদ হিসাব, আর তাদের সাফল্য যাচাই করে হচ্ছে। আজ যদি হঠাৎ লোকসান বলে দেওয়া হয়, তবে কার জন্য এটা হয়েছে, লোকে সেটা জানতে চাইবে, আর তাতে ব্যাঙ্ক পরিচালকদের বদনাম হবে, তা তারা কেন নিতে যাবে? তারাও তো ঠিক ইচ্ছে করে দেয়নি, অনেক চাপে পড়ে দিয়েছে।

আমি এতক্ষণ যা বললাম তা কম বেশি হবেই, ধরে নিতে হবে। যদি ভেবে থাকেন কেউই কাজে ফাঁকি দেবে না, খুশি মত ছুটি নেবে না, ওভার টাইম পাবার আশায় কাজে ঢিলেমি করবে না, চুরি করবে না, ঘুঁষ খাবে না, নিজেদের মধ্যে রেষারেষি থাকবে না, শ্রমিকরা দাবিদাওয়া সব শিকেয় তুলে রাখবে, কোন আন্দোলন করবে না, বুঝিয়ে বললেই সব হবে, জোর গলায় কথা বলতে হবে না, বকাবকি করতে হবে না, তবে বুঝব ম্যানেজ করা আপনার ধাতে পোষাবে না। এ সবই থাকবে; তার ওপর সরকারকে শ্রমিকের শ্রুতিমধুর কথা শোনাতে হবে, আর বিরোধী পক্ষ গরম বক্তৃতা দিয়ে কিছু ফয়দা ওঠাবে। এর মধ্যেই পরিচালককে কাজ করতে হবে। কিছুটা গ্যাস, কিছুটা বুঝ, কিছুটা বাবা-বাছা, কিছুটা ঘুঁষ, কিছুটা পুশ, দরকার হলে ফোঁস, ছোবল, যেমন করে পারেন সংস্থাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অধর্ম তো দুনিয়ায় থাকবেই স্বয়ং ভগবানও তা বন্ধ করতে পারেন নি, তাই অধর্মের হাত থেকে ধর্মকে বাঁচাবার জন্য বার বার তাঁকে ধরাধামে আসতে হয়। নাস্তিকের চোখে দেখতে গেলে তিনি যা করেছেন সব তো ভাল বলা চলে না। তারা আজ না হয় আপনার কাজের তীব্র সমালোচনা করবে; তাতে কি আসে যায়? যতক্ষণ আপনি ঠিক আছেন, এবং নিজের স্বার্থের জন্য করছেন না? আপনার ত বিচার হবে সব কিছু মিলিয়ে, কতটা সার্থক আপনি হতে পারছেন তাই দেখে। আজকে যাঁদের আমরা মহাপুরুষ বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি তাঁদের মধ্যে খুব কমই সমালোচনার হাত থেকে বেঁচেছেন, বরঞ্চ প্রাণটাই হারাতে হয়েছে, মহিমাকীর্তন অনেক পরে।

শিল্পে চালু কয়েকটি কথার মানে

টাইম স্টডি—কোন্ কাজ করতে কতটা সময় লাগবে তার হিসেব করা।

জব—কাজ। কুলেণ্ট—কাটবার সময় যাতে গরম কম হয় তার জন্য যে তেল বা জল দেওয়া হয়।

ফেটিগ—খানিক কাজ করে হাঁপিয়ে ওঠা, ইচ্ছা না থাকলেও।

অ্যালাউড—যা দেবেন।

পেট্রোল—ঘুরে ঘুরে কাজ করা।

সিস্টেম—রীতি।

সপ স্টুয়ার্ড—প্রতি সপে ইউনিয়নের মাতব্বর।

ওয়ার্ক স্টাডি—পুরো কাজটা কাজের জায়গায় যে ভাবে হচ্ছে যে মেসিনে, যাকে দিয়ে, মাল কতটা সরানো হচ্ছে তা বিচার করে দেখা।

মেথড স্টাডি—কি ভাবে হচ্ছে তার বিস্তারিত বিবরণ, বিশেষ করে যে করছে তার, কেন করা হচ্ছে, অন্য কোন ভাবে সহজে করা যেত কিনা ইত্যাদি।

মোশন স্টাডি—কাজ করার সময় মনুষের শরীরের যে অংশ কাজ করে, যেমন হাতটা এগোলো, কাজটা ধরল, ঠিক মত বসাল, ঘোরাল ইত্যাদি।

কস্টিং—বিস্তারিত ভাবে হিসেব করে কাজের দাম ঠিক করা।

ডিপ্রিসিয়েশন—যে কোন জিনিষই সময়ে খারাপ হয়, চালু মেসিন বেশি তাড়াতাড়ি খারাপ হয়, এই খারাপ হওয়া বা ক্ষয়ে যাওয়াকে বলা হয়। যেমন গাড়ির টায়ার ৩০,০০০ মাইল গেলে, বাস পাঁচ সাত বছরে, ঘরের প্লাসটার দশ বছরে এতটা খারাপ হয় যে মোটা টাকা খরচ করে সারানো পোষায় না। তারই প্রতি বছরের হিসাব।

মেইনটেনেন্স—সারাই করে চালু রাখা, যেমন ঘরে চুনকাম, দরজায় জানলায় রঙ, মেসিনের অয়েলিং ক্লিনিং।

অ্যাসেট—সংস্থার বাজার-দর, ঘরবাড়ি, জায়গাজমি, মেসিনপত্তর, কাঁচা বা অন্য মাল সব কিছুর দাম থেকে—ধার আর অন্যের পাওনা টাকা বাদ দিয়ে যা থাকে।

এফিসিয়েন্সি—যা করছি আর যা করতে পারতাম তার তুলনামূলক হিসাব। যেমন বলা হয় পাওয়ার প্ল্যাণ্ট শতকরা ৩০ হারে কাজ করছে। যদিও দেবার ক্ষমতা আছে ৪০০ মেগাওয়াট দিচ্ছে ১২০ মেগাওয়াট।

অথরিটি—প্রভুত্ব বা নির্দেশ দেবার অধিকার, কাজ করিয়ে নেবার মত দরকারি অধিকার। পুরস্কার, তিরস্কার, বোনাস, শাস্তি দেবার অধিকার কিছুটা এর মধ্যে পড়ে।

রেসপনসিবিলিটি—কাজের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার সামর্থ্য।

অ্যাকাউনটিবিলিটি—যে কাজ দেওয়া হয়েছে, আর যে টাকা পয়সা, লোকজন বা অথরিটি দেওয়া হয়েছে তাকে কতটা সার্থক ভাবে খরচ হয়েছে সেটা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব।

ফিল—অনুভব করা। ইমোশন—ভাবপ্রবণতা

মোটিভেশন—কাজ করার ঔৎসুক্য। ড্রাইভ—এগিয়ে যাবার আগ্রহ।

মালিক—যে টাকা পয়সা জুগিয়েছে, যে সংস্থাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে ইচ্ছুক, এবং খরচা খরচ সেই হিসেবে করে। যে শুধু খরচ করার দায় দায়িত্ব নেয় সে মালিক নয়, পদের বলে তাকে ঠিক মালিক বলা চলে না, এটা মনোভাবের ওপর বেশি নির্ভরশীল।

বিচিত্র বিদ্যা গ্রন্থমালা : ২৪

শ্রীভূপাল দত্ত পেশায় বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এর অধ্যাপক ; এর আগে তিনি ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল-এ, ইংলণ্ডের আলফ্রেড হাবার্ট লিমিটেড-এ দায়িত্বশীল পদে কাজ করেছেন। তবে ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেশি, স্বক্ষেত্রে লব্ধ জ্ঞানকে দেশের কাজে নিয়োগ করতে তিনি বেশি সক্রিয় ; এইজন্যই তিনি বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি কল্পে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বৃত্তিমূলকশিক্ষা ও কৃষিশিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। শিল্প-পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কেও তিনি বিশেষভাবে অবহিত এবং রীতিমতো অভিজ্ঞ।
বস্তুত শ্রী দত্ত তাঁর অধীত বিদ্যা এবং লব্ধ অভিজ্ঞতার প্রণোদনায় 'বিজ্ঞানভিত্তিক পরিচালনা' পুস্তকখানি রচনা করেছেন। তিনি যে সাধারণ পাঠক সম্প্রদায়কে সামনে রেখে এই পুস্তিকা রচনা করেছেন তা নয়, শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানান্ ভাবে যাঁরা যুক্ত, প্রকৃতপক্ষে এ বইয়ের লক্ষ্য তাঁরাই। কিন্তু সাধারণ পাঠক এ বই থেকে কৌতূহলোদ্দীপক বিচিত্র-বিষয়ে পরিচয় লাভ করবেন। শিল্প শ্রমিকের এবং শিল্প পরিচালনার আভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যা এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে—হাল্‌কা চালে, কিন্তু বিষয়ের গুরুত্ব বজায় রেখে।

মূল্য : ছয় টাকা